বঙ্গেশ্বর।

—○::০::○—

প্রতাপাদিত্য ও রানপাল

প্রণেতা

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি, এল,

প্রণীত।

উলুবেড়িয়া।

উলুবেড়িয়া দর্পণ যন্ত্রে

শ্রীচুনিলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০২।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

উপহার।

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ [illegible]

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন,—

দেবপূজায় সকলের অধিকার আছে। আমি সেই সাহসে এই ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। যেদিন আপনার পদপ্রান্তে বসিয়া অতীতের কত কথা শিখিতাম সেদিন অনন্তকাল সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু সেদিনের স্মৃতি যায় নাই। যখনই নিভৃত চিন্তায় সেই দিনের ছবি দেখিতে পাই তখনই আপনার আকাঙ্ক্ষাশূন্য শান্তিপূর্ণ দেবমূর্ত্তি আমার অন্ধকারময় হৃদয় আলোকিত করে। সেইদিনের স্মরণার্থ আমার এই পূজা গ্রহণ করিলে চরিতার্থ হইব।

উলুবেড়িয়া, \
২৮এ ডিসেম্বর ১৮৯৪।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী \
শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গেশ্বর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাতুড়িয়া রাজবাড়ী।

১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পাঁচশত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন একটী বালক ও বালিকা ভাতুড়িয়ার রাজ বাড়ীর প্রাঙ্গনে খেলা করিতেছে। রাজপ্রাসাদের সাজ সজ্জা ও বালক বালিকার পরিচ্ছদ দেখিলে বোধ হয় উহা কোন মুসলমান আমীরের বাড়ী কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমীদার রাজা গণেশচন্দ্র সিংহের বাড়ী। বালক তাঁহার একমাত্র পুত্র চৈতন্য ও বালিকা ছিন্ন কুমারী তাঁহার কন্যা। উভয়েই আফগান পরিচ্ছদে ভূষিত, দেখিলে আফগান বালক বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রায় দুই শত বৎসর হইল আফগানেরা বঙ্গ অধিকার করিয়া বঙ্গে সুবিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। বঙ্গে তখন আফগান পরিবর্ত্তনের স্রোত এক টানা। যাঁহারা ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেন তাঁহারা কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই সম্ভ্রান্ত আফগানদের মত থাকিতেন। এমন কি নামেও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা না হইলে

কিন্তু একবার ইঁহাদের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই। রাজা গণেশচন্দ্রের প্রাসাদের চারিদিকে যে আফগানী ধরণের উচ্চ প্রাচীর ছিল, তাঁহার প্রাসাদ যেরূপ আফগানী ধরণে চক মিলান ছিল, ইঁহাদের বাড়ী আর সেরূপ নাই। প্রায় দেড় শত বৎসর হইল ইংরাজরাজ বঙ্গ অধিকার করিয়াছেন। আফগান অধিকারের প্রায় দুই শত বৎসরের পর যেরূপ বঙ্গদেশের গণ্য মান্য অধিবাসীগণ আফগান রূপে পরিণত হইয়াছিলেন আজ ইংরাজরাজের দেড় শত বৎসর অধিকারের পর দেশের গণ্য মান্য অধিবাসীগণ ইংরাজরূপে পরিণত হইতেছেন। তাঁহারা একবারও মনে করেন না যে তাঁহারা স্বীয় স্বদেশের উন্নতি কামনায় যত্ন করেন না কেন তাঁহারা অনাথ হইয়া ক্রমে বিজাতীয় ভাবে বিভোর হইতেছেন, ইঁহাদের অংশজ সমস্ত সংস্কারই তাঁহাদের উত্তরবংশীয়গণ পরিত্যাগ করিয়া চৈৎমল্লের ন্যায় জালালউদ্দিন হইবেনা তাহা কে বলিল? মানবজাতির ইতিহাসে এইরূপ কত পুনরাবৃত্তি আছে। আমরা ইতিহাস পাঠ করি কেন? যাঁহারা আফগান জ্ঞানে, মানে, ধনে ও স্বদেশ হিতৈষিতায় বাঙ্গালীর শীর্ষ স্থানীয় তাঁহারাই ইহার উত্তর জানেন, আমরা তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া সময়ের স্রোতে ভাসিতেছি, কোথায় যাইব, জগদীশ্বর জানেন।

বালক বালিকা যেখানে খেলা করিতেছিল, সেই স্থানে একটী ফকীর আসিয়া উপস্থিত হইল ও বালক বালিকাকে স্বধর্ম্মাবলম্বী মনে করিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া বসিল ও ফারসিতে তাহাদের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিল। ফকীর চৈৎমল্লের সুন্দর মুখশ্রী ও আফগান পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে

আকবার বালক মনে করিয়াছিল। তাঁহার হাত দেখিয়া বলিল তোমার নাম "জালালউদ্দীন" তুমি একদিন দেশের বাদশাহ হইবে।" এই কথা শুনিয়া বালক বালিকা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, ও বলিল ফকীর সাহেব ঠিক হাত গুণিয়া ছিলু। ছেলের নাম জালালউদ্দীন বলিয়াছেন। নামও যেমন ঠিক বলিয়াছেন, সে যে ভবিষ্যতে বাদশাহ হইবে তাহাও সেইরূপ ঠিক বলিয়াছেন। ফকীর অপদস্থ হইয়া আবার বালকের হাত লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন যাহা আমি বলিয়াছি তাহা ঠিক। আল্লার ইচ্ছা হইলে এই বালক জালাল-উদ্দীন হইবে ও অনেক কাফেরকে উদ্ধার করিবে।

এইরূপ গোল হইতেছে শুনিয়া রাণি হৈমবতী সেইখানে আসিলেন। বালক বালিকা দৌড়িয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার দুই হাত ধরিল ও বালিকা বলিল "মা এই ফকীর বলিতেছে দাদার নাম জালালউদ্দীন ও সে দেশের বাদশাহ হইবে"। হৈমবতী একটু হাসিলেন, ফকীর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য। তাঁহার হাত দেখিয়া বলিল "মা তুমি অচিরে বঙ্গেশ্বরী হইবে। যেদিন তুমি বঙ্গেশ্বরী হইবে সেই দিন আমি আবার আসিব।" এই বলিয়া ফকীর কোথায় চলিয়া গেল। গণেশ চন্দ্র যখন এই সকল কথা শুনিলেন, ফকীরের অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু ফকীরকে আর পাইলেন না।

——:0:——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

গঙ্গাসাগর যাত্রা।

ভাতুড়িয়া দিনাজপুরের একটী পরগণা, গণেশ চন্দ্র দিনাজ-পুরেরও জমিদার ছিলেন। তিনি উত্তররাঢ়ি কায়স্থ। বর্ত্তমান সময়ের দিনাজপুরের রাজারা তাঁহারই বংশসম্ভূত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে গৌড়ে আজম শাহ বাদশাহ। গিয়াসউদ্দীন সুলতান তখন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন। পিতৃ রক্তে ও ভ্রাতৃশোণিতে পদপ্রক্ষালিত করিয়া তিনি পিতৃসিংহা-সনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি [illegible] পিতাকে নিহত করিয়া ও ভ্রাতৃগণের চক্ষু উৎপাটন করিয়া পিতৃসিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। যে দেশের রাজা এইরূপ পিতৃহন্তা সে দেশ একেবারে উৎসন্ন যায় নাই কেন এই আশ্চর্য্য। রাজা এরূপ অত্যাচারী হইলেও বিচারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা কখন রাজপুরীর বাহিরে যাইত না। দেশের লোক জানিত কাজীই তাহাদের রাজা। কাজীর বিচারের উপর লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। কাজীরা নির্ভীক হৃদয়ে যথার্থ বিচার করিতেন। যে গিয়াসউদ্দীন পিতৃ ও ভ্রাতৃ শোণিতপাত করিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তিনিও কাজীকে উপেক্ষা করিতে সাহস করেন নাই। এক সময় পাখী শীকার করিতে যাইয়া সুলতান ভ্রমক্রমে এক বিধবার একমাত্র পুত্রকে শরা-ঘাত করিয়াছিলেন। বিধবা কাজীর নিকট সুলতানের নামে

নালিশ করিল। নির্ভীক ও ন্যায় পরায়ণ কাজী বঙ্গেশ্বরের নামে পরওয়ানা বাহির করিলেন। যথা সময়ে সুলতান বিচার আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহাকে সামান্য অপরাধির ন্যায় অর্থদণ্ড করিয়া সেই অর্থ বিধবাকে দিবার আদেশ করিলেন। সুলতানও তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ বিধবাকে দিলেন। সেই বিধবানারী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে আদালত ভঙ্গের পর কাজী তখতে বসিয়া সুলতানকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলে পর গিয়াসুদ্দিন বলিলেন যে আপনি ন্যায় বিচার করিয়া ভালই করিয়াছেন নচেৎ সিংহাসন হইতে উঠিলেই এই তরবারি দ্বারাতে আপনাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতাম। নির্ভীক কাজী বলিলেন যে সুলতান যদি আজ আইনের মর্য্যাদা না রাখিতেন তাহা হইলে কাজীর বেত এতক্ষণ তাঁহার পিঠ কাটিয়া শোণিত বাহির করিত। এইরূপ নির্ভীক ও ন্যায়-পরায়ণ বিচারক ছিলেন বলিয়া রাজা অত্যাচারী হইলেও দেশের লোক অপেক্ষাকৃত সুখ ও শান্তিতে দিন কাটাইত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বঙ্গদেশে অধিকাংশ জমীদার গণেশ চন্দ্রের ন্যায় এক এক চাকলা শাসন করিতেন। তাঁহাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, বন্দুক ও কামান ছিল। এবং তাঁহারা অধিকাংশই গণেশ চন্দ্রের ন্যায় কায়স্থ ছিলেন। গণেশ চন্দ্র একজন শিক্ষিত, উন্নতমনা পরাক্রান্ত ও হিন্দু মুসলমান জাতি কর্ত্তৃক সমাদৃত, জমিদার ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ, গড়, সেনানিবেশ, বারুদখানা প্রভৃতি দেখিলে তাঁহাকে একজন প্রবল রাজা বলিয়াই বোধ হইত। তিনি স্বজাতির উন্নতি কামনায় নানা লোক হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন।

কিন্তু সর্ব্বদা আফগান আমীরের ন্যায় থাকিতেন ও পুত্র কন্যাকে সেই ভাবেই শিক্ষিত করিতেছিলেন। তিনি পিতৃ ও ভ্রাতৃ হন্তা গিয়াসউদ্দীনকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। কখন কখন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগরূক হইত। রাণী চৈতন্যবতী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভৃত্য হইয়া রাজার অনুরাগ কামনা যে কতদূর অন্যায় তাহা বুঝাইয়া, ও বিফল মনোরথ হইলে সে কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা বুঝাইয়া তাঁহাকে এতদিন ঠিক পথে রাখিয়াছিলেন আজ একজন সামান্য ফকীরের কথায় তাঁহার চিত্তের বিকৃতি হইল। তিনি সেই ফকীরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যবতী প্রকৃত হিন্দু রমণী। যদ্যপি স্বামী ও পুত্রকন্যাকে মুসলমানি সাজ পরাইতেন। তাঁহারা যে মুসলমানি খাবার খাইতেন তাহাতেও আপত্তি করিতেন না। তবে গণেশ চন্দ্র বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কখনও তাঁহাকে সেইরূপ কোন খাদ্য খাওয়াইতে পারেন নাই। পুরাকালীন হিন্দুরমণীর ন্যায় হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি যখন বুঝিলেন যে স্বামীর চিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কলুষিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার মনোবৃত্তি অন্য পথে লইবার জন্য সাগরে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বহুরূপ যুক্তি দেখাইলেন গণেশ চন্দ্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বলিলেন সুলতান জানিতে পারিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ধৃত করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি ভাতুড়িয়ার দুর্গে থাকিয়া সুলতানকে উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গঙ্গাসাগর যাইবার পথে সুলতানের হাত হইতে কে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে?

হৈমবতী অতি সুশীলা ছিলেন, তিনি স্বামীর কথায় অত্যন্ত মনে ব্যথা পাইলেন, কিন্তু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। একেবারে পূজার ঘরে যাইয়া শিবপূজা করিতে বসিলেন। গণেশ চন্দ্র রাজকার্য্যে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন গিয়াছে কিন্তু হৈমবতীর পূজা শেষ হয় নাই। গণেশ চন্দ্র বুঝিলেন কেন এত দীর্ঘ পূজা তিনি ধীরে ধীরে পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন হৈমবতী ধ্যানে নিমগ্না যেন হিমাচলে মহেশের ধ্যানে নিমগ্না গৌরী, তিনি হৈমবতীকে ডাকিলেন, একবার দুইবার তিনবার, উত্তর নাই। তিনি তখন চকিত হইয়া হৈমবতীর গাত্র স্পর্শ করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল; বলিলেন "মহাদেব আসিয়াছ, আমার স্বামীকে সুমতি দাও, তাঁহাকে রক্ষা কর" বলিয়াই চক্ষু খুলিয়া দেখি-লেন স্বামী সম্মুখে। তখন লজ্জিত হইয়া বলিলেন আর দেখিতে পাইলাম না তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছেন। গণেশ হাসিয়া বলিলেন আমিই তোমার শিব, আমি গঙ্গাসাগরে যাইবার জন্য বর দিতে আসিয়াছি সমস্ত আয়োজন। কিন্তু সামান্য বেশে অন্য যাত্রীর সঙ্গে যাইতে হইবে কেহ জানিতে না পারে যে আমরা তীর্থে যাইতেছি। তীর্থযাত্রার জন্য হিন্দুরমণী না সহিতে এমন কষ্ট এ জগতে কি আছে। স্বামীর কথায় তিনি প্রফুল্লিত হইলেন, সামান্য যাত্রীর ন্যায় যাইতে হইলে যে কত কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইতে হইবে তাহা ভুলিয়া গেলেন।

গণেশ বিষয় রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া পুত্র কন্যাকে তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর হস্তে দিয়া এক দিন রাত্রে অন্য অন্য যাত্রীর সঙ্গে

গঙ্গাসাগরে যাত্রা করিলেন। অন্যথা স্বইচ্ছায় আপনাকে কত কষ্ট দেয় তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

—:::—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

প্রত্যাবর্ত্তন।

ঘোর অন্ধকার অমানিশায় একখানি ক্ষুদ্র তরণী গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগত হইতেছিল। ঝুপ ঝুপ করিয়া দাঁড় পড়িতেছে। আরোহীগণ প্রায় সকলই নিদ্রিত, নৌকা সুন্দর বনের নিকট দিয়া আসিতেছে। অদূরে বুড়ী নামক গ্রাম। একটী স্ত্রীলোক নিঃশব্দে রোগীর সেবায় নিযুক্ত। রোগী তাহার স্বামী। নৌকার কষ্টে ও সাগরের বালুমিশ্রিত জল খাইয়া তাহার বিসূচিকার ন্যায় রোগ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য আরোহীগণ জানিতে পারিলেই তাহাদিগকে নামাইয়া দিবে এই ভয়ে তাহারা রোগের কথা এখনও প্রকাশ করে নাই। রোগীর যন্ত্রণা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। জল জল করিয়া রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। নৌকা পালভরে তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া মহাশব্দে দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, আরোহীগণ মহাসুখে নিদ্রিত। সেই জন্য রোগীর কাতরোক্তিতে এতক্ষণ তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ক্রমে রোগী অধিকতর কাতর হইয়া পড়িল, তাহার চিৎকারে একে একে সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। আরোহীগণ স্থির করিল রোগীর মৃত্যু নিকট একজনের জন্য সকলে মরিবে কেন

তাহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা ক্রমে সকলের বিসূচিকা হইবে তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ আদেশ হইল। পাল নামিল নৌকাও তীরে লাগিল। এই রোগীই আমাদের গনেশচন্দ্র এবং শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার স্ত্রী হৈমবতী। গনেশ যন্ত্রণায় অস্থির তিনি কিছুই বুঝিলেন না। হৈমবতীর অন্তরাত্মা শুকাইল। বুঝিলেন তাঁহারও দিন নিকট হইয়াছে। মৃত প্রায় স্বামীর মুখের দিকে দেখিলেন, অতিকাতর হইয়া সম্মুখস্থ আরোহীর পায় ধরিয়া বলিলেন আমাকে রক্ষা কর আমার স্বামীর সামান্য অসুখ বিসূচিকা নয়, উহাকে ফেলিয়া দিওনা। কিন্তু সেই নির্দ্দয় বৃদ্ধের কিছুতেই দয়া হইল না। সে বলিল গঙ্গাসাগরে মৃত্যু সৌভাগ্যের কথা, তোমার স্বামী আর নৌকায় থাকিলে অগতি হইবে শীঘ্র নামাইতে দেও। এই বলিয়া তিন চারি জন ধরাধরি করিয়া রোগীকে তীরে তুলিয়া তাহাকে উত্তর শিয়রে শুয়াইয়া আবার তাহারা নৌকায় উঠিল। হৈমবতী লাফাইয়া পড়িতে যাইতেছিলেন। কিন্তু একটা বাঁশ তাহার মাথায় বাজিল। সেই আঘাতে অচৈতন্য হইয়া নদীতে পড়িয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। আরোহীরা এদিক ওদিক একটু খুঁজিল কিন্তু আর তাঁহাকে পাইল না।

গনেশ মৃত প্রায় হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। আরোহীরা নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই বৃষ্টি নামিল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টির ধারে গনেশের চৈতন্য হইল। তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি হাঁ করিয়া বৃষ্টির জল খাইতে লাগিলেন ক্রমে তাঁহার পিপাশা শান্তি হইল। রোগের যন্ত্রণা কমিল কিন্তু উঠিবার

সামর্থ্য নাই। হৈমবতীকে ডাকিলেন। কোথায় হৈমবতী? সকলে তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? শিয়রে হাত দিয়া বুঝিলেন তিনি মাটিতে। নৌকায় নয়। বুঝিলেন আরোহীরা তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। হায় হৈমবতীও এসময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে!!! এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। তাঁহার মরিতে ইচ্ছা হইল, মনে মনে ভাবিলেন আমি মরিলাম না কেন। ইচ্ছা হইল গড়াইয়া নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সামর্থ্য নাই।

ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। গনেশ কখনও মূর্চ্ছিত কখনও চৈতন্য প্রাপ্ত অবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন। সেই নিবিড় জঙ্গল হইতে যে আর কখনও বাহিরে যাইবেন তাঁহার সে আশা ছিলনা। কতক্ষণে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করিবে তাহাই তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল। একবার হৈমবতীর সেই স্নেহময় মুখ মনে পড়িল, পুত্র হৈমচন্দ্রের কথা মনে পড়িল, সেই সুদূর জন্মভূমির কথা মনে পড়িল। গনেশ চন্দ্র আবার মূর্চ্ছিত হইয়া সেই নদীর তীরে পড়িয়া রহিলেন।

—*—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০০০০—

সন্ন্যাসী।

বাঁশের আঘাতে হৈমবতীর মস্তক ফাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার চৈতন্যলোপ হইয়াছিল। নদীতে পড়িয়া ভাসিতে

ভাসিতে আবার গঙ্গাসাগর মুখে যাইতে লাগিলেন। জলে ধৌত হইয়া রক্তস্রোত বন্ধ হইল। তরঙ্গাভিঘাত ক্রমে তাঁহাকে তীরে আনিয়া ফেলিল তখনও তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা হয় নাই। যখন চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন একখানি তৃণকুটীরে কয়েক-জন জেলের মেয়ে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা অত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কিছুরই উত্তর দিলেন না। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। স্বামীর মৃতকালের দুরবস্থার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে শেল বিঁধিতে ছিল।

পরদিন সুবর্ণ বণিকের বিনা ব্যয়ে একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি লইয়া তাহাতে উঠিয়া গভীর রাত্রে ক্ষুদ্র নৌকা স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। কি মনে করিয়া স্রোতে ভাসিলেন তাহা তিনিই জানেন। আত্মহত্যার ইচ্ছা হইলে অনায়াসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিতেন, কিন্তু হৈমবতী তাহা করিলেন না। অথচ ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া যথেচ্ছ স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া আত্মহত্যা বই আর কিছুই নয়। মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেই পাওয়া যায় না। জগদীশ্বরের অভিপ্রায় না হইলে কেহ কি মরিতে পারে? আত্মহত্যাও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।

ক্ষুদ্র নৌকা তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। হৈমবতী নিদ্রিত। কত সুখ স্বপ্ন তাঁহার মনে উদয় হইয়া তাঁহার তাপিত প্রাণকে শীতল করিতেছে। অভাগার পক্ষে নিদ্রা ও স্বপ্ন কি মধুর!!

একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তীর হইতে এই ক্ষুদ্র নৌকা দেখিতে পাইলেন। তিনি এই নৌকায় একটী মাত্র স্ত্রীলোক আরোহী দেখিয়া চমকিত হইলেন বুঝিলেন কোন উপায়ে

ইহাকে রক্ষা না করিলে ইহার মৃত্যু নিশ্চয়। নৌকাখানি তীর হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে, ক্রমশঃই দূরে যাইতেছে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর একখানা নৌকা আবশ্যক। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কোনদিকে নৌকা নাই। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাসী লাফ দিয়া সমুদ্রে পড়িলেন ও সাঁতার দিয়া যাইয়া নৌকা ধরিবার চেষ্টা করিলেন। বহু কষ্টে সাঁতার দিয়া যাইয়া সন্ন্যাসী নৌকা ধরিলেন। তিনি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার নোকা বাহিয়া আনিবার সামর্থ্য ছিলনা। আর নৌকায়ও চালাইবার কোন রূপ যন্ত্র ছিলনা। সুতরাং নৌকা পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছ যাইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর আগমনে হৈমবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সম্মুখে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীর শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া হৈমবতীর ভক্তি হইল। তাঁহাকে আপনার দুর্দ্দশার কথা সমস্ত বলিলেন। সন্ন্যাসীর করুণ হৃদয় তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইল। তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন. "মা তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই। তুমি রাজরাণী হইবে, সন্ন্যাসীর কথা অবিশ্বাস করিওনা"।

হৈমবতী সন্ন্যাসীর কথায় একটু হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি তখনই বিষাদে নিবাইয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন হৈমবতী তাঁহার কথা কেবল স্তোভ বাক্য মনে করিলেন।

সন্ন্যাসী কত চেষ্টা করিলেন নৌকা কিছুতেই তীরের দিকে নিতে পারিলেন না। তীরবেগে যেন তাঁহাকে উপহাস করিতে করিতে নৌকা ভীষণ মৃত্যু মুখে ছুটিল। অনাহারে ও কষ্টে

হৈমবতী অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী প্রাণপণে নৌকা তীরাভিমুখে লইবার জন্য দুই হাতে দাঁড়ের কায করিতে লাগিলেন। অনাহারে ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া সন্ন্যাসী ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

আবার প্রভাত হইয়াছে। নৌকা এক অজানিত দেশে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। সন্ন্যাসী হৈমবতীকে লইয়া তীরে উঠিয়া লোকালয়ের অন্বেষণে চলিলেন। কতদূর যাইয়া একটা গ্রাম দেখিলেন। কিন্তু কোন লোক তাঁহাদের দেখিয়া বাহির হইল না। কাছে যাইয়া দেখিলেন কত শব পড়িয়া পচিতেছে, আর কত লোক বিসূচিকা রোগে মৃতপ্রায় হইয়া জল জল করিতেছে। সন্ন্যাসী তাহাদের জল দিয়া যাইয়া বন হইতে কি ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলেন, যে রোগী ঔষধ খাইতে পারিল সেই বাঁচিয়া উঠিল। আর যাহারা ঔষধ খাইতে পারিলনা তাহারা মরিয়া গেল। সন্ন্যাসী ও হৈমবতী সাধ্যমত সকলের সেবা শুশ্রূষা করিলেন, সন্ন্যাসীর সাহস দেখিয়া হৈমবতীর ও সাহস হইল। একটা প্রকাণ্ড চিতা প্রস্তুত করিয়া শবরাশি দাহ করা হইল। তাহার পর সন্ন্যাসী সেই গ্রামটী পোড়াইয়া দিলেন, কেবল কয়েকটা পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ব্যতীত আর সকলই পুড়িয়া ছাই হইল।

—০:০:০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—••*••—

একি স্বপ্ন না প্রত্যাদেশ।

ভাট্টরিয়ার রাজবাড়ীতে একটী সুন্দর কক্ষে চৈৎময় নিদ্রিত। পিতামাতার জন্য বালক ভাবিয়া ভাবিয়া শীর্ণ হইয়াছে। তাহার আর সে শ্রী নাই। আজ মন্ত্রী অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছেন। আশা দিয়াছেন আজই প্রাতে তাহার পিতা মাতা ফিরিয়া আসিবেন। এসংসারে আশাই অভাগ্যের এক মাত্র অবলম্বন। রোগী রুগ্ন শয্যায়, ভাবিতেছে কাল তাহার অসুখ সারিবে। দুঃখের নিষ্পীড়নে যাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহার জীবন দুর্ব্বিসহ ভারবোধ হইতেছে, যেই আশার রেখা তাহার মনে সঞ্চার হইয়া অস্ফুটস্বরে বলে, “চিরদিন কখনও সমান যায়না,” অমনি সে কোমর বান্ধিয়া আবার জীবন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। আজ তুফানে পড়িয়া নৌকা ডুবু ডুবু, তবু আশা, কাল এ দুর্দ্দিন থাকিবে না। মন্ত্রীর কথায় বালক বালিকা আশায় হৃদয় বাঁধিয়া স্থির হইয়া ঘুমাইয়াছে। ঠিক সে সময়ে গণেশচন্দ্র মৃতপ্রায়, তাঁহাকে নৌকা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই বালক চৈৎময় ও বালিকা ছিজন কুমারী স্বপ্ন দেখিল যেন তাহাদের পিতা বিসূচিকায় পীড়িত, মৃতপ্রায়, কতকগুলা লোকে জোরকরিয়া তাহাদের মায়ের নিবারণ না শুনিয়া তাঁহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিতে যাইতেছে, মা চৈৎবতী তাঁহাকে ধরিতে যাইয়া না পারিয়া সমুদ্রে পড়িয়াগেলেন, বালক ও বালিকা ঠিক এক সময়ে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ভেদী

আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাসাদ কাঁপাইয়া তুলিল, প্রাসাদবাসী সকলে বালক বালিকার কক্ষে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রথমতঃ কিছুই বলিতে পারিলনা। পরে অনেক সান্ত্বনা করিলে উভয়েই একই রূপ ভয়াবহ অমঙ্গলের কথা বলিল। সকলেই স্তম্ভিত হইল, মন্ত্রী সকলকেই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বৃথা তাঁহার মুখের চেহারায় তাঁহার মুখের আশ্বাস বাক্য যে কেবল মৌখিক তাহা বালক বালিকাও বুঝিল। পরে পুরোহিত আসিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তোমরা পাগল আপনার মন্দ স্বপ্ন দেখিলে পরের হয়, আমি কি বৃথাই নারায়ণকে প্রত্যহ শত তুলসী দি। তোমরা ব্যস্ত হইওনা আমি ঠাকুরঘর হইতে আসি। এই বলিয়া সেই শ্বেতকেশ ও শ্বেতবেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরঘরে যাইয়া হোম করিয়া নারায়ণকে তুলসী দিতে লাগিলেন, তাঁহার বোধ হইল যেন নারায়ণ কাঁপিতেছেন যেন ঠাকুরঘর দুলিতেছে, তুলসী ঠাকুরের মাথায় যেন রহিতেছেনা। তিনি একমনে নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন যেন গণেশচন্দ্র ও হৈমবতী তাঁহার সম্মুখে তাঁহারা যেন দেবতা হইয়া আকাশে মিশাইয়াগেলেন, বৃদ্ধব্রাহ্মণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তখন অনেক বেলা হইয়াছে। বালক চৈৎমল্ল ও বালিকাদ্বিজ্ঞপ স্থির হইয়া ঠাকুরঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। কি দাদা ঠাকুর বাবা ও মা কেমন আছেন, যেন দাদা ঠাকুর তাঁহাদের নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ আসিয়াছেন। পুরোহিত বলিলেন কোন ভয় নাই এই তুলসী লও, ও এই অর্ঘ্যপান কর, বালক ও বালিকা ভক্তিভাবে তাহাই করিল।

আজ এই বিশালপুরীর লোকসকলই বিমর্ষ। সে দুর্দ্দিনে বঙ্গে ডাক ও কি তাড়িতের বন্দোবস্ত ছিলনা। সুতরাং শীঘ্র-কোন সংবাদ পাইবার আশাওনাই। প্রভুর আদেশছিল যে তিনি যে সাগরে চলিলেন ইহা বাহিরে কেহজানিতে নাপারে, তাঁহার সন্ধানে অশ্বারোহী পাঠাইলে ত সকলেই জানিবে যে তিনি দুর্গেনাই কিন্তু বালক বালিকার মুখে অলীক স্বপ্নের কথা শুনিয়া যে কেন মন্ত্রীর মন এত চঞ্চল হইল তাহা তিনি স্বয়ং কিছুই বুঝিতে পারিলেননা। বালক বালিকা পুরোহিতের মিষ্ট কথায় ভুলিল কিন্তু মন্ত্রী কিছুতেই স্থির হইতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল এস্বপ্ন নয় এ প্রত্যাদেশ। তিনিস্থির থাকিতে পারিলেননা, প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া চারিদিকে অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন।

কিছুদিন পরে গঙ্গাসাগর হইতে সকলে প্রত্যাগত হইলেন। তাহারা প্রকাশ করিলেন যে গণেশ ও হৈমবতী বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চৈৎমল্ল ও হিরণ কাঁদিয়া অস্থির হইল, মন্ত্রী, সেনাপতি, দুর্গপাল প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যগণ সকলেই অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মনুষ্যের বিপদ একা আসেনা। বিপদের উপর বিপদ। শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল সুলতান গিয়াস উদ্দীন গণেশের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া দুর্গ অক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছেন। মন্ত্রী যে সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহারই একজন গণেশের কোন নিকট জ্ঞাতি শত্রুর অর্থে বশীভূত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পাণ্ডুয়ার যাইয়া সুলতানকে সমস্ত

সংবাদ দিয়াছে। সেই জাতি শত্রু মহেশচন্দ্র সিংহ যাঁহাকে গণেশ আজন্ম প্রতিপালন করিয়াছেন তিনিই গুপ্ত পথের সন্ধান বলিয়া সুলতানকে পাণ্ডুয়া হইতে মালদহের মধ্যদিয়া আজ ভাটুরিয়ায় আনিয়া সেই আজন্ম প্রতিপালনের ঋণ প্রতি-শোধ করিয়াছেন। বৈদেশীক জাতি আমাদের জাতীয় চরি-ত্রের যে নিন্দাকরেন তাহা কি কতক পরিমাণে সত্যনয়। আমরা কেবল অভিমান করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক দুর করিবার কি চেষ্টাকরিতেছি? কোন্ জাতির ইতিহাস এরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত, জয়চন্দ্র না থাকিলে কি পৃথ্বী পরাজিত হইত? না ভারতে যবন আসিত? এখন ও আমারা কি দেখিতে পাই। চাহিয়াদেখ দেখিবে বাঙ্গালি হৃদয়ে হিংসা ও দ্বেষে পরিপুর্ণ, কিসে আমাপেক্ষা যে অধিক ক্ষমতাশলী ও ধনী তাঁহাকে জব্দ করিব এ চিন্তা যেন বাঙ্গালীর মূল মন্ত্র দেখিবে স্বজাতির সহিত আমাদের মিল নাই। এক জন স্বজাতির প্রভুত্ব আমরা সহ্য করিতে পারিনা। কিন্তু অনায়াসে বৈদিশীকগণের পদ সেবায় আপনার জীবন সার্থক মনে করি। যত দিন হিংসা ও দ্বেষ আমাদের মন হইতে বিদুরিত ন. হইবে, ততদিন আমরা পর পদ দলিত থাকিব।

—:০:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—**—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত মন্ত্রী শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। চৈৎমল

বালক হইলেও পিতার পরোলোক সুখ কামনায় হিন্দু বালকের অবশ্য পালনীয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছে।

তাহার সেই সুন্দরমুখে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে। পিতা-মাতার কত আদরের ধন চৈৎমল্ল আজ যুগপৎ পিতৃমাতৃ হীন হইয়াছে। তাহার জীবনে যেন যুগ পরিবর্ত্তন হইয়াগিয়াছে। অথচ গণেশ চন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া গিয়ছেন আজ দুই মাস হয়নাই। হায় এসংসারে সুখের দিন কত শীঘ্রই চলিয়া যায়! সকলে যখন শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত সুযোগ বুঝিয়া গিয়াসউদ্দীন বহু সৈন্য লইয়া ভাটুরিয়ার দুর্গ অবরোধ করিলেন মন্ত্রী বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গরক্ষা করিতে পারিলেন না। সাধারণ সৈন্যগণ প্রভুর মৃত্যু সংবাদে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাপতি সুলতান প্রদত্ত অর্থে বশীভূত হইয়া দুর্গ প্রবেশের গুপ্ত দ্বারের সন্ধান তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন!!!

রাত্র দুই প্রহরের পর যখন সকলে নিদ্রিত সেই সময় একজন দুইজন করিয়া যবন দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহারা দ্বার রক্ষক-দিকে হত্যা করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল তখন দলে দলে যবন দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল। পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক চৈৎমল্ল অর্দ্ধাহারে শীর্ণ তথাপি তরবারি হস্তে সকলের অগ্রে বাহির হইয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এসংসারে তাহার আর কে আছে, কাহার জন্য জীবন রাখিবে, তাহার সাহস দেখিয়া সুলতান আশ্চর্য্য হইলেন, আদেশ দিলেন "বালককে কেহ বধ করিওনা, সিংহ শাবক ধরিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ কর" তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মন্ত্রী ও তাঁহার পুত্র বিনয় ও অনেক সৈন্য সেই দিকে ঝুঁকিল, মৃত দেহের পাহাড় হইতে লাগিল, হিন্দুর

"হর হর মহাদেব," ও যবনের "আল্লাহো," রবে নৈশগগন ভেদ করিয়া দিগদিগান্তর কাঁপাইয়া তুলিল। ক্রমে "হর হর মহাদেব" রব নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে বারুদ খানায় আগুন লাগিয়া দুর্গের এক অংশ উড়িয়াগেল। কত হিন্দু ও যবন একই মুহূর্ত্তেই চির দিনের মত অনন্ত ধামে চলিয়া গেল। হিন্দুরা ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিল। বিনয় ও চৈৎমল্ল ডাকিল "হে দুর্গে দুর্গতি নাশিনি এ কাল রাত্রি যেন আর প্রভাত না হয়"।

রাত্রি তাহাদের কথা শুনিলনা, যথাসময়ে দিনমণি উদয়াচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, যবনের জয় হিন্দুর পরাজয়, কত হিন্দুর প্রাণ গিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক অধিক ধৃত হইয়াছে। তাহারা প্রাতে প্রাণ দণ্ড হইবে স্থির করিয়া সেই অজানিত দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল। সুলতান গিয়াসুদ্দীন স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর ছিলেননা, পর দিন যথা সময়ে দরবারে বসিয়া বন্দিগণকে আনাইলেন। যাহারা আর কখন তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেনা বলিয়া তামা তুলসী হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল তিনি তাহাদের ছাড়িয়া দিবার আদেশ দিলেন। আর যাহারা ঐরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিল তাহাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন। এক জনের ও প্রাণ দণ্ড হইলনা। সর্ব্বশেষে তিনি চৈৎমল্ল, বিনয়, মন্ত্রী ও হিঙ্গন কুমারীকে আনিবার আদেশ দিলেন তাঁহারা যুদ্ধের নিয়মানুসারে বন্দী, তিনি চৈৎমল্ল, মন্ত্রী ও বিনয়কে তামা তুলসি লইয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে বলিলেন। বালক চৈৎমল্ল ক্রোধে

আত্মহারা হইয়াছিল। সে গীয়াসউদ্দীনকে "পিতৃহন্তা ভ্রাতৃহন্তা" বলিয়া গালি দিল ও বলিল তিনি চোরের মতন তাহার দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। নতুবা সে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিত, তিনি তাঁহার পিতার প্রতি পুত্রের শেষ কর্ত্তব্য যে শ্রাদ্ধ তাহা নষ্ট করিয়াছেন তাঁহার মত পিশাচের নিকট সে কোন অনুগ্রহ চাহেনা। মরিতে হয় মরিবে, একবার বই দুবার ত মরিবেনা। বৃদ্ধ মন্ত্রীর দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে ছিল, মন্ত্রী মনে করিলেন চৈৎমল্ল যেরূপ উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে এখনই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু গীয়াসউদ্দীন তাহার কোন কথায় উত্তর দিলেন না, প্রহরি দিগকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেল। গীয়াসউদ্দীন দেখিলেন মন্ত্রী কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ যুদ্ধের অনুপযুক্ত, আপনি যাইতে পারেন পরে বিনয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন তোমায় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। বিনয় বলিল মরিতে একবার বই দুবার হয়না, মরিতে হয় মরিব, আমি প্রতিজ্ঞা করিবনা। হিঙ্গণ সুলতানের মুখেরদিকে অতি কাতরভাবে চাহিল ও বলিল "জঁহাপনা আমার দাদাকে ও বিনয় দাদাকে রক্ষা করুণ মা দুর্গা আপনার মঙ্গল করিবেন"। সুলতান বালিকার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন আমি কিকরিব, উহারা আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিতেছে। উহারা আর যুদ্ধ করিবেনা বলিলেই ত ছাড়িয়া দিতাম তোমাকে ও উহাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দিতাম। হিঙ্গন বলিলেন "বিনয় দাদা তোমাদের পায় পড়ি তোমরা সুলতান যাহা বলিতে বলেন তাহাই বল, চল আমরা ভিক্ষা করিয়া খাইব সেও ভাল, বাবা ও মা চলিয়া গিয়াছেন

তোমরাও কি আমাকে ফেলিয়া যাইবে ?” বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কুমারীর বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র, এই বয়সেই হিঙ্গন বালিকা বয়সের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বিনয়, হিঙ্গন, ও চৈৎমল্লের ন্যায় রাজবাড়ীতে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতি পালিত হইয়া আসিয়াছেন। বিনয় হিঙ্গণকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, হিঙ্গণের সহিত বিনয়ের বিবাহ দিবেন গণেশ ও হৈমবতী উভয়ের ইচ্ছা, কেবল মন্ত্রীর আপত্তি রাজকুমারীর থাকি বার উপযুক্ত প্রাসাদ তাঁহার নাই। যখন তিনি রাজকুমারীর জন্ত বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারিবেন তখন বিবাহ দিবেন। গণেশ স্থির করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ দিবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছায় কি হইবে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা না হইলে কি হইবে ?

কুমারীকে কাঁদিতে দেখিয়া বিনয় বড়ই কাতর হইলেন পরে স্থির হইয়া বলিলেন, হিঙ্গণ স্থির হও, তুমি রাজ কুমারী হইয়া এই দস্যুর কাছে জীবন ভিক্ষা চাহিতেছ ছি ! বালিকা আর কাঁদিতে পারিল না, অতি দীন ভাবে সুলতানের দিকে তাকাইল, সুলতান বলিলেন তুমি তোমার দেশের রাজাকে দস্যু বল তোমার প্রাণ দণ্ড হওয়া উচিত। প্রহরী লইয়া যাও। প্রহরীরা বিনয়কে লইয়া চলিয়া গেল, হিঙ্গণের মস্তক ঘুরিতে লাগিল সে মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সুলতান তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেগমের শিবিরে লইয়া যাইতে বলিয়া খিন্ন মনে দরবার ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন।

—:০০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——•:o:•——

পাণ্ডুয়া।

একবৃন্তে দুইটী ফুল।

আমাদের এই পাণ্ডুয়া বৈষ্ণ পাণ্ডুয়া নহে; মালদহের নিকট আফগান সুলতানগণের গৌড়েরন্যায় আরএক রাজপুরী ছিল, সেই রাজপুরী পাণ্ডুয়া নামে বিখ্যাত ছিল। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা যে একসময় অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা জানা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দীন পাণ্ডুয়ার রাজ পুরী অমর পুরীর ন্যায় সাজাইয়া ছিলেন। তিনি মুসলমান সম্রাটগণের ন্যায় বহু পত্নীক ছিলেন না। তাঁহার একটী মাত্র বেগম ছিলেন। তাহার এক পুত্র তাঁহার নাম সৈফ উদ্দীন ও একমাত্র কন্যা সুলতানা রিজিয়া। রিজিয়া অতুলনিয়া সুন্দরী। রাজবালার রূপে প্রাসাদ উদ্ভাসিত। তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর, তিনি এখন ও বালিকার ন্যায় বিদ্যা ও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিবাহের প্রস্তাবে অসম্মত। বিবাহের কথা হইলেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। সেইজন্য গিয়াস উদ্দীন এতদিন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। আফগান আমীরগণ অতিশয় বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহু বেগম বিশিষ্ট পুরী নাহইলে আমীর পুরী হয় না এই ধারণায় তাঁহারা শত শত বিবাহ করিতেন। অনেক আমীর ও জাইগীর দার রিজিয়া কে বেগম করিবার জন্য কত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি এইরূপ বেগম হইতে অস্বীকার করিয়া কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে জীবন কাটাইবেন স্থিরকরিয়া ভাষা ও সঙ্গীত বিদ্যায় জীবন

উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল, রাজপুরী যেন তাঁহাকে পাইয়া হাসিত। তিনি যাহার নিকট যাইতেন সেই প্রফুল্ল হইত, সেইমনে করিত, তিনি তাহাকেই স্নেহ করেন: তাঁহাকে রাজপুরীতে সকলেই মান্য করিত। রাজপুরীতে তাঁহার গতি অবারিত।

এই রাজপুরীতে চৈৎমল্ল ও বিনয় বন্দী স্বরূপে অবস্থিত। তাঁহারা বন্দী হইয়া রিজিয়ার কল্যানে রাজ ভোগে অবস্থিত রিজিয়া প্রত্যহই তাঁহাদের তত্বাবধারণ করেন। চৈৎমল্ল ও বিনয় উভয়কেই রিজিয়া অতিশয় স্নেহ করেন। হিঙ্গণ তাঁহার সখী স্বরূপে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সহিত আসিয়া চৈৎমল ও বিনয় কে দেখিতে পান। এইদুর্দ্দিনে তাহাদের মনে যতদূর শান্তি থাকিতে পারে তাহার জন্য রিজিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করেন। পিতাকে বলিয়া বন্দী দুইজনের মুক্তির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সুলতান কিছুতেই সম্মত হননাই। তিনি বলিয়াছেন উহারা যতদিন তাঁহার ও তাহার বংশীয় সুলতান গনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেনা এই প্রতিজ্ঞা নাকরিবে তিনি ততদিন উহা দিগকে বন্দী অবস্থায় রাখিবেন। এবং উহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য সামান্য বন্দীর ন্যায় কারাগারে পাঠাইবেন মনস্থ করিয়া ছিলেন? কিন্তু রিজিয়ার অনুরোধে তাহা এত দিন করিতে পারেন নাই!

রিজিয়া প্রহরিগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া বন্দিগণের মুক্তির উপায় করিয়া দিবেন স্থির করিয়া হিঙ্গণের সহিত পরামর্শ করিলেন। হিঙ্গণ জানিত গিয়াসউদ্দীন কোন্ দিন চৈৎমল্ল ও বিনয়কে কাটিয়া ফেলিবেন, কেবল রিজিয়ার জন্য এতদিন

পারেন নাই। হিঙ্গন তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন বলিলেন, "সই তুমি দেবতা, তুমি দেবীর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ, তোমার যাহাতে বিপদ হইবে এরূপ কায আমরা করিবনা, রিজিয়া হিঙ্গনকে আদর করিয়া বলিলেন, কাহার সাধ্য আমার কোন অনিষ্ট করে, আমার ভয় পাছে কোন দিন বিনয় ও চৈৎমল্লের গর্ব্বিত তিরস্কার বাক্যে পিতার ক্রোধহয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ, মনে করিলেও তোমার জন্য আমার শরীর, সিহরিয়া উঠে। আমি বিনয় ও চৈৎমল্লকে কত বুঝাইয়াছি, তাঁহারা পিতাকে, পিতৃহন্তা, ভাতৃহন্তা, পরস্বাপহারী দস্যু বলিয়া তাঁহার সম্মুখেই তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তাঁহারা বুঝেন না পিতার এক কথায় তাঁহাদের শরীর দ্বিখণ্ডিত হইবে। কাল পিতা যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন তাহাতে কোন্ সময়ে যে কি হইবে বলা যায় না, তিনি কালই উঁহাদের কারাগারে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার পায় ধরিয়া উঁহাদের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইয়াছি। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি উঁহারা রাজপুরী হইতে পলায়ন করিলে পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

হিঙ্গন বলিলেন "সই যাই কোথায়, খাই বা কি? আমাদের যথাসর্ব্বস্ব সব, তোমার পিতা"——এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হিঙ্গন হঠাৎ থামিয়া গেলেন দেখিলেন রিজিয়ার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মনে হইল আমি অকারণে সইয়ের মনে কষ্ট দিয়াছি, আজি দুই বৎসর ছোট ভগিনীর মত যত্ন করিয়া যিনি প্রতিপালন করিয়াছেন যিনি পিতৃকৃত অপরাধের প্রতিশোধের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত তাঁহার মনে কষ্ট

দিয়াছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই ভাবিতে ভাবিতে হিঙ্গন কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন "আমাকে ক্ষমাকর" রিজিয়ার চক্ষের কোণে যে এক ফোটা জল আসিয়াছিল তাহা রুমালে পুঁছিয়া, রিজিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "কেন ব'ন কি হইয়াছে যে তোমাকে মাপ করিব তুমিত কোন অপরাধ কর নাই। আমার এই ছোট ব'নটী কি আমার কাছে কোন অপ-রাধ করিতে পারে।" এই বলিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিয়া এমনই মধুর আদর মাখা ভাবে তাঁহার সরল সুন্দর মুখের দিকে চাহিলেন যে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল ও অশ্রুজলে কপোল ভাসিয়া গেল; উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া উভয়েই ভুলিলেন যে তাঁহারা ভিন্নজাতি ও একজন বন্দিনী ও অপরা রাজকুমারী। একবৃন্তে দুইটী ফুল কি সুন্দর? কেবলে হিন্দু মুসলমানে অপার বিদ্বেষ? হৃদয় হৃদয়ে মিশিলে হিন্দু মুসলমান প্রভেদ থাকে না।

রিজিয়া বলিলেন "ব'ন টাকার ভাবনা কি? তুমি কি আমার টাকা লইতে সঙ্কোচ মনে কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া একটী বড় কৌটা খুলিয়া দেখাইলেন, বলিলেন ইহা তোমার ও বিনয়ের বিবাহের যৌতুক, হিঙ্গন দেখিলেন উহা নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে ও অনেক স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। রিজিয়া আরও বলিলেন, যখন তোমার দাদার বিবাহ হইবে, আমাকে সংবাদ দিও, আমি যাইয়া তোমার দাদার স্ত্রীকে স্বহস্তে সুবর্ণা-লঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিয়া আসিব। তোমার দাদা আমাকে যবন কন্যা মনে করিতে পারেন, কিন্তু তুমি তা পারনা, তুমি আমি এক। এই জন্য তোমার কাছে এই সব কথা বলিলাম।

তোমার দাদা কি বিনয় জানিতে পারিলে তোমাকে এই অলঙ্কার কি অর্থ লইতে দিবেন না, এই জন্য ইহা তোমাকে লুকাইয়া লইতে হইবে।” হিঙ্গন ভাবিলেন রিজিয়া যবন কন্যা নহেন, তিনি পুরাণোক্ত কোন দেবী তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন।

হিঙ্গন বলিলেন “সই তোমার যাহাতে কষ্ট হইবে তাহা আমি করিলে আমার নরকে যাইতে হইবে, আমি অর্থ ও অলঙ্কার না লইলে তোমার মনে কষ্ট হইবে, সেই জন্য আমি সবই লইব। কিন্তু একটী প্রতিজ্ঞা কর যখন তোমার বিবাহ হইবে তখন আমাকে সংবাদ দিও, আমি তোমাকে স্বহস্তে বিবাহের পূর্ব্বে সাজাইব। জগদীশ্বর দিন দেন আমার ভূষণে আমি সাজাইব, না দেন তোমার ভূষণ লইয়া তোমাকে সাজাইব। যিনি তোমাকে বিবাহ করিবেন তিনি বুঝিবেন যে কোন্ দেবী তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন।

রিজিয়া আবার মধুর হাসি হাসিলেন বলিলেন, “সে কবে হিঙ্গন, এজন্মে না পরজন্মে? তবে তুমি যদি দেবতা হইতে তাহা হইলে আমি তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া তোমার হৃদয় মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইতাম। তোমায় আমায় কি বিবাহ হয় না হিঙ্গন?” হিঙ্গন হাসিল। রিজিয়াও হাসিলেন, “বলিলেন, পাগলামি রাখ, চল যাই দেখি চৈৎমল্ল ও বিনয় কি করিতেছেন।”

——:০:——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——•:০:•——

মানবী না দেবী?

রাজপুরীর এক প্রান্তে বিনয় ও চৈৎমল্ল এক প্রাসাদে বন্দী, রাজভোগে থাকিয়াও তাঁহারা বন্দী বই আর কিছুই নহেন, তাঁহারা প্রাসাদে ও প্রাসাদস্থিত উপবনে যদিচ্ছা ক্রমে বেড়াইতে পান কিন্তু বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই। আজ বিনয় ও চৈৎমল্ল উভয়ে এই উপবনে বেড়াইতেছেন। আজ উভয়েই বিমর্ষ, গিয়াসউদ্দীন তাঁহাদের দেখিতে আসিয়া ছিলেন, চৈৎমলের উদ্ধত স্বভাবে বিরক্ত হইয়া তিনি আদেশ দিয়া গিয়াছেন, যে আজ হইতে তাঁহাদের সাধারণ কারাগারে যাইতে হইবে। তিনি উহাঁদিগকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিবার জন্য ও হিজনের সহিত তাঁহার পৌত্র সমসুদ্দীনের সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার এ প্রস্তাবে চৈৎমল ও বিনয় আপনাদিগকে মহাগৌরবান্বিত মনে করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া উভয়েই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া দর্পের সহিত বলিয়াছেন যে তাঁহারা মরিতে প্রস্তুত। চৈৎমল আরোও বলিয়াছেন যে হিজনকে তিনি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া মহানন্দার জলে ভাসাইয়া দিতে প্রস্তুত তথাপি যবনের দাসী হইতে দিতে প্রস্তুত নহেন। যবনে ও কুকুরে তিনি কোন প্রভেদ দেখিতে পান না। চৈৎমল্লের বাল্যকালে মুসলমানের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিলনা, বরং অন্তে যে তাঁহাকে মুসলমান আমির সন্তান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত

তাহাতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। কিন্তু পিতার মৃত্যু সংবাদের পর হইতে তাঁহার জীবনে ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যে মুসলমানকে অন্তে যবন বলিলে তাঁহার কষ্ট হইত তিনি তাহাদিগকে যবন ভিন্ন অন্য নামে অভিহিত করিতেন না। তিনি সৈফউদ্দীন ও সমসউদ্দীনের ঔদ্ধত্যায় ও তাঁহাদের ঘৃণিত চরিত্র দেখিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তিনি গিয়াসউদ্দীনকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কেবল রিজিয়া যখন রূপে আলো করিয়া মধুর কথায় তাঁহার বিপদে সহানুভূতি দেখাইতেন তখন রিজিয়াকে দেবী মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি রিজিয়াকে ভক্তি করিতেন সত্য, কিন্তু কখনও ভাল বাসার চক্ষে দেখিতেন না।

অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধে পদচারণ করিতে করিতে বিনয় বলিলেন "চৈৎমল্ল তুমি ভাল কর নাই, গিয়াসউদ্দীন দেশের সুলতান তাঁহাকে অপমান করা ভাল হয় নাই। বন্দী অবস্থায়ও তোমাকে কথক পরিমাণে সুখে রাখিয়াছেন, কারাগারের কষ্ট কি তোমার সহ্য হইবে? হিঙ্গনই বা তোমাকে না দেখিয়া থাকিবে কি করিয়া।" হিঙ্গনের নাম শুনিয়া চৈৎমল্লের চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন কি করিব, আর সহ্য হয় না, সেই দিন যদি মৃত্যু হইত ত ভাল হইত, জানিনা কি পাপে এই কষ্ট পাইতেছি। হিঙ্গনের জন্য এখন ও মরিতে পারি না, নতুবা আমি এক তরবারির আঘাতে আমার সমস্ত যন্ত্রণার শেষ করিতে পারিতাম। যদি পিতা হিঙ্গনের বিবাহ দিয়া যাইতেন তাহা হইলে আজ আমাকে এই যবনের ভয়ে ভীত হইতে হইত না। জীবনে সকলেরই কোন না কোন আশা আছে। আমার কি

আশা? আমি জীবিত থাকিয়া আর কি করিব, চিরকাল এই যবনের অন্ধ কারাগারে থাকিয়া কি সুখ, আমি ভাবিতেছি হিরনকে তোমার হাতে দিয়া আমি সেই অনন্ত ধামে চলিয়া যাইব। পিতা ও মাতা আমার পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহারা আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের সহিত পৃথিবীর সকল সুখ চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যু যাহাতে আমার আকাঙ্ক্ষণীয় হয় তাহাও তাঁহারা করিয়া দিয়াছেন আমি যে এখনও মরিতে পারিনাই সে কেবল আমার ভীরুতা। আমার মত অভাগার পক্ষে আত্মহত্যা মহাপাপ নয়, যাঁহার দ্বারা এ পৃথিবীর কোন রূপ উপকারের প্রত্যাশা আছে তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা মহাপাপ আমার পক্ষে নয়। মৃত্যুই এক্ষণে আমার পক্ষে উন্নত তর জীবনের সোপান।

বিনয় তাঁহার এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন ছি! চৈৎময় তোমার মনে এই সকল চিন্তা স্থান পাইয়াছে! মৃত্যু উন্নততর জীবনের পথ সত্য, সময় ক্রমে সেই পথে একদিন আমরা উঠিব সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মহত্যা করিয়া সেই পথে উঠিবার কাহারও অধিকার নাই। জগদীশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কাহারও সেই পথে উঠিবার সামর্থ্য নাই। মৃত্যু সন্ধিস্থল, মৃত্যু উন্নতি ও অবনতির পথের মিলন স্থল, আজ আত্মহত্যা করিয়া তুমি সেই সন্ধিস্থল হইতে অবনতির পথে অগ্রসর হইবে। অনন্ত কাল ধরিয়া লোকে তোমাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিবে। মৃত্যুতে তোমার আপাতত এই যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে কিন্তু পৃথিবীতে তুমি যে অপকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে তাহার কি কখনও শেষ হইবে? তুমি কেবল নিজের সুখের জন্য লালায়িত

লোকে ইহাই কি ভাবিবে না? তুমি হিজনের দিকে তাকাইলে না, আমার দিকে তাকাইলে না, নিজেসুখী হইবে বলিয়া আত্মহত্যা করিয়া কি তুমি যথার্থই সুখী হইবে? তোমার আত্মার কি তৃপ্তি হইবে? কখনই নয়, তোমাকে কোন্ অবনতির পথে যাইতে হইবে কে বলিতে পারে? আজ আমরা বন্দী ইচ্ছা করিলেই পলাইতে পারি, পলাই না কেন? না প্রাণ ভয়ে পলায়ন অপেক্ষা হীনতার কার্য্য আর কি আছে! সুলতান কি ভাবিবেন? দেশের লোকে কি মনে করিবে? এই জন্যই আমরা পলাই না। আত্মহত্যাও কি এইরূপ সংসার কারাগার হইতে পলায়ন করা নয়? যে দিন আমাদের শাস্তির দিন শেষ হইবে, আমরা জগদীশ্বরের আদেশ মত অনন্ত ধামে চলিয়া যাইব। আত্মহত্যা করিয়া তুমি কখনও সেই অনন্ত ধামে পিতামাতার নিকট যাইতে পারিবে না।"

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় হিজন ও রিজিয়া সেই স্থানে আসিলেন। তাঁহারা যে আসিয়াছেন তাহা বিনয় ও চৈৎমল্ল জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কথা হইতে হিজন ও রিজিয়া উভয়েই বুঝিলেন যে কি সর্ব্বনাশের কথা হইতেছে। রিজিয়া চৈৎমল্লের দিকে তাকাইয়া বলিলেন 'ছি আপনি কি বালক, বালকেও এইরূপ কাজ করেনা, আপনি কি মনে করেন এদুর্দ্দিন কি চিরকাল থাকিবে, আপনি রাজ কুমার, পিতৃরাজ্য উদ্ধার না করিয়া কি বলিয়া পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। আপনি সাহসী যোদ্ধা, মরিতে আপনার ভয় নাই, সুতরাং আপনি কারাগারেই বা যাইবেন কেন, আমি আজই আপনার মুক্তির উপায় করিয়া দিতেছি। আপনি

যথেচ্ছ অস্ত্র লইউন, বাছিয়া অশ্ব লইউন। আপনার গতি কেহ প্রতিরোধ করিবে না, যদি কেহ করে, আপনি পথ পরিষ্কার করুন, আবশ্যক হয় বীরের ন্যায় সেই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে পিতার নিকট চলিয়া যাইবেন। আপনি রাজকুমার আত্মহত্যার কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। রিজিয়ার এই যুক্তিযুক্ত গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া চৈৎমল্ল তাঁহার মুখেরদিকে তাকাইলেন, দেখিলেন, সেই দেববিনিন্দি মুখে অহঙ্কারের ছায়া মাত্র নাই, সেই স্নিগ্ধ মধুর ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যেন কোন স্বর্গের সুরবালা সুরপুরী হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। একবার মনে হইল যেন সেই সুন্দর আনত আননে একটু বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, তাঁহার ভ্রম, প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সেই মুখ হাসিতে ভরা।

চৈৎমল্ল তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন প্রহরীগণ কিছুই জানেনা, হঠাৎ যাইয়া আমি তাহাদের আক্রমণ করিয়া বধ করিলে আমি নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইব আমি এরূপ মুক্তির কামনা রাখি না। তাহা অপেক্ষা অন্ধকারাগারে থাকা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

রিজিয়া বলিলেন আপনি প্রহরীদিগকে বধ করিবেন কেন, আমি আপনাকে গুপ্তদ্বার দিয়া কেল্লার বাহির করিয়া দিব, প্রাসাদস্থিত কোন প্রহরীই আপনাকে আমার সহিত যাইতে দেখিলে কিছুই বলিবে না; আমি তাহাদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়াছি। আর যত অর্থের আবশ্যক তাহা আনিয়াছি, আপনি আমার দান গ্রহণ না করেন যখন আপনার সময় হইবে আমার

নামে একটী অনাথ নিবাস স্থাপন করিবেন, তাহা হইলেই অর্থ আমি পাইব। আর হিঙ্গনকে আপনারা সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহেন লইউন, না হয় আমার নিকট রাখিয়া যান, পরে যেখানে বলিবেন সেইখানে পাঠাইয়া দিব।

বিনয় তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, চৈৎমল্ল রাজকুমারী যথার্থ দেবী, তুমি যে বল তিনি মানবী নহেন, স্বর্গ হইতে অবরোহণ করিয়া কখন কখনও আমাদের সান্ত্বনা দিতে আইসেন তাহা সত্যই। তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা সুন্দর উপায় আমার বৃদ্ধ পিতা স্থির করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। চল আজই রাত্রে আমরা এই দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। হিঙ্গন এখন রাজকুমারীর নিকট থাকিবে, পরে আমার পিতার নিকট যাইবে।

চৈৎমল্ল বলিলেন রাত্রে চোরের ন্যায় তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে প্রাসাদ হইতে যাইতে অসম্মত, কারণ প্রহরীরা তাহা হইলে রাজকুমারীর চরিত্রে সন্দিহান হইবে। যাহাতে রাজকুমারীর দেব চরিত্রে সন্দেহের ছায়া পড়িতে পারে এরূপ কার্য্য করিতে তিনি অসম্মত। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। রাজকুমারী যদি তাঁহাকে অস্ত্রদান করেন তাহা হইলেই তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করিবেন। যখন তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাইবার জন্য সৈন্য আসিবে তিনি সশস্ত্র থাকিলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইবেন। এবং সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে।

রিজিয়া অতিকাতর কণ্ঠে বলিলেন "কুমার, জগদীশ্বর আপনাকে উন্নতির পথে যাইতে বলিতেছেন, কেন এরূপে আত্মবলিদান করিবেন, ইহাও একরূপ আত্মহত্যা মাত্র, নিশ্চিত

মৃত্যু জানিয়া মৃত্যু আকাঙ্ক্ষায় সৈন্য ও প্রহরীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা কি আত্মহত্যা নয়? কুমার এখনও আপনি আপনার খুঁজিতেছেন, হিজলের কথা ভাবিলেন কৈ, আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে আমার কথা রাখুন, আমি সুখী হইব, বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে, কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি আপনি ইচ্ছা করিলে এখনও সুখী হইতে পারিবেন জগতের মঙ্গল করিতে পারিবেন।

চৈৎমল্ল তথাপি নিরুত্তর। রিজিয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, কুমার একটী কথা আপনাকে বলিয়া কষ্ট দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তা না শুনিলে আপনি যাইবেন না, আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি আপনার পিতার বিসূচিকা হইয়াছিল কিন্তু আপনার মাতার বিসূচিকা হয় নাই, যে নরাধমগণের সহিত তাঁহারা সাগরে গিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাদিগকে গহন কাননে হিংস্র জন্তুর মুখে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল, তাহারই মধ্যে একজন আমার পিতাকে সংবাদ দিয়া লইয়া যাইয়া আপনার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। একজন ফকীর আসিয়া পিতাকে বলিয়াছেন যে আপনার পিতামাতা এখনও জীবিত আছেন এবং আপনার পিতা অচিরে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। যাহাতে আপনার পিতা আর দেশে না আইসেন সেই জন্য আমার পিতা প্রচার করিয়াছেন যে আপনাকে তিনি কাটিয়া ফেলিয়াছেন, আর হিজলকে মুসলমান করিয়া সমসুদ্দীনের সহিত বিবাহ দিয়াছেন, এ সংবাদে আপনার মাতা মৃত্যু শয্যায়, আপনাকে দেখিতে চাহেন, আপনি গেলে

এখনও তিনি বাঁচিতে পারেন। ফকীরের কথা কখনও মিথ্যা নয়, আপনার পিতা যথার্থই জীবিত, কিন্তু আপনি তাঁহার নিকট না গেলে তিনি বনে বনে সন্ন্যাসী থাকিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবেন, আর আপনাকে না দেখিয়া কতকষ্টে যে আপনার মাতার মৃত্যু হইবে, তাহা আপনিই মনে করুন, তাঁহার কথা শুনিয়া চৈৎমল্লের সেই বালককালের ফকীরের কথা মনে হইল। আবার পিতা জীবিত, মাতা মৃত প্রায়। এই অন্ধকারাগারে থাকিলে এ জীবনে আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষ্যাতের সম্ভাবনা নাই এ চিন্তা অসহনীয় বোধ হইল। রাজপুরী হইতে পলায়ন করাই স্থির করিলেন।

——○:oo:○——

নবম পরিচ্ছেদ।

—○:o:○—

হুরিভৈরপি বর্ত্তুম আত্মসাৎ।
প্রযতস্তে নৃপসূনবোহিদৎ॥
হতুপস্থিতম-গ্রহীদজঃ।
পিতুরাজ্ঞেতি নভোগতৃষ্ণয়া॥

কালীদাস।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রচার হইল যে বন্দী দুইজনই পলায়ন করিয়াছে। কত অনুসন্ধান হইল, কিছুতেই কোন সন্ধান পাওয়াও গেল না। সৈফউদ্দীন প্রহরীগণকে ধরিয়া অমানুষিক

যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি তাহারা কিছুই স্বীকার করিল না। রিজিয়া যখন শুনিলেন তাঁহার কৃত কার্য্যের জন্য প্রহরীগণ পৈশাচিক পীড়নে পীড়িত, তখন তাঁহার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিল, তিনি একেবারে সৈফউদ্দীনের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিলেন, প্রহরিগণকে সুরাপানে অচৈতন্য করিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতে তিনি বন্দীগণকে ছাড়িয়া দিয়াছেন সে দোষ সমস্তই তাঁহার। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই কথা বলিলে প্রহরীরা নিস্তার পাইবে, কিন্তু তাঁহার ভুল হইয়াছিল। সৈফ-উদ্দীন প্রহরীদিগকে অধিকতর পীড়ন আরম্ভ করিলেন। আর রিজিয়াকে অন্ধকারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। বেগম আসিয়া কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না, বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহরীদিগকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন আর রিজিয়াকেও কাটিবার আদেশ হইল।

গিয়াসউদ্দীন প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে রিজিয়াকে অন্ধকারাগারে লইয়া গিয়াও সৈফউদ্দীন সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিয়াছেন তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি রিজিয়াকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, নিজে কারাগারে যাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনি-লেন। এই সামন্য কারণে সৈফউদ্দীন বিদ্রোহী হইয়া সম-সুদ্দীনকে লইয়া রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইয়া বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। গিয়াসউদ্দীন বুঝিলেন তিনি যে বিদ্রোহী হইয়া পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন এ তাহারই প্রতিশোধ। তিনি একে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন আবার,

যুদ্ধে পাছে পুত্র বা পৌত্র নিধন প্রাপ্ত হয় এই ভয়ে রীতিমত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপযুক্ত পুত্র ও পৌত্র বৃদ্ধের জন্য কিছুই ভাবিলেন না, অনায়াসে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া সৈফউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রিজিয়া ও বেগমকে একঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

হিরণকে রক্ষা করিবার জন্য দাসীর বেশে রিজিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে রাজবাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। এই অপরাধে সমসুদ্দীন রিজিয়াকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু সেই চিরপ্রফুল্ল দেবীর কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি মায়ের দুঃখে দুঃখিনী, কিসে মায়ের কষ্টের লাঘব হয় সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। জননীকে আল্ কোরাণের সুন্দর বয়াৎ পড়িয়া শুনাইতেন। বেগম রাজরাজেশ্বরী হইয়াও যে সুখশান্তি তাঁহার মনে ছিল না, রিজিয়ার ধর্ম্মতত্ত্বের কথা শুনিয়া কারাবাসিনী হইয়াও তাঁহার মনে ততোধিক শান্তি হইতে লাগিল।

এদিকে সমসুদ্দীন পিতৃসিংহাসন লোলুপ হইয়া অতি অল্প দিনে বিষ প্রয়োগে সৈফউদ্দীনকে বধ করিয়া স্বীয় পথ পরিষ্কার করিলেন। মুসলমান শাসনকাল এইরূপ যে কত ঘৃণিত নৃশংস ব্যাপারে কলঙ্কিত তাহা কে বলিতে পারে। পিতা পুত্রে ভ্রাতা ভগিনীতে যে কোনরূপ স্নেহের বন্ধন থাকিতে পারে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। অথবা আমরা মুসলমান রাজগণের দোষ দিই কেন। চাহিয়া দেখিলে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টীয়ান কত রাজবংশে এই নৃশংস ব্যাপার দৃষ্টি গোচর হইবে।

রিজিয়া সর্ব্বদা মায়ের সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং তাঁহার ভাবিবার সময় ছিল না। কিন্তু যখন নিশীথ নিস্তব্ধে আপন হৃদয় কন্দরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত তখন দেখিতে পাইতেন যে তাঁহার হৃদয় মন্দিরে একটী দেবমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি কাহার তাহা কি আর বলিতে হইবে? তিনি জানিতেন চৈৎমল্ল কখনও তাঁহার হইবেন না। তথাপি তাঁহার হৃদয় চৈৎমল্লময়। তিনি হৃদয়ের সেই নিভৃত কক্ষে সেই দেবমূর্ত্তির ধ্যান করিতেন, ধ্যান করিয়াই সুখী। তিনি ভাল বাসিতেন সত্য কিন্তু প্রতিদানের প্রত্যাশিনী নহেন। পাছে হিন্দন কি চৈৎমল্ল জানিতে পারেন এই ভয়ে কখনও বিশেষ আবশ্যক না হইলে চৈৎমল্লের প্রাসাদে যাইতেন না। তিনি সকলের দুঃখেই সহানুভূতি করেন হিন্দন এই বুঝিয়াছিলেন। চৈৎমল্লও তাহাই বুঝিয়াছিলেন। চৈৎমল্লের আঁধার হৃদয় ও তাঁহাকে পাইলে আলোকিত হইত, তাঁহাকে দেবীমূর্ত্তি ভাবিয়া পূজা করিতেন, ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইত। রিজিয়া বঙ্গের সুলতানের একমাত্র কন্যা, পিতার আদরে আদরিণী, চৈৎমল্ল হিন্দু, কাফের, তাহাতে আবার বন্দী, তিনি কি তাঁহাকে ভাল বাসিতে কখনও সাহস করিতে পারেন?

———০:০০:০———

দশম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

কস্তত্বং বা কুত আয়তঃ
তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রান্তঃ।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর গণেশ দেখিলেন একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। মনে মনে কি ভাবিলেন, হৈমবতীর কথা স্মরণ হইল হৈমবতীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিলেন, হৈমবতীর জন্য এ জগতে কোন স্থানে তিনি যাইতে না পারেন, কোন কষ্ট না তিনি অনায়াসে সহিতে পারেন, হাসিতে হাসিতে শতবার মরিতে পারেন। সেই হৈমবতী তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা অসহ্য, তাঁহার মৃতদেহের গতিকরিতে অসমর্থ হইলেও হৈমবতী গহনবনে তাঁহার মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসী একমনে তাঁহার মুখেরদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি অমানুষিক যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন। বলিলেন "বৎস কেন মিছা মায়ায় বদ্ধ হইয়া সংসারী হও, যদি স্ত্রী পুত্রকে ভাল না বাসিতে, তাহা হইলে আজ আর কষ্ট পাইতে না। এ সংসারে কেহ কাহারও স্ত্রী নয়, কেহ কাহারও পুত্র নয়, সকলই মায়ার মোহ, অন্ধকার হইতে আসিয়া অন্ধ-কারে মিশাইয়া যাইতেছ, তথাপি মায়ার মোহ ভাঙ্গিল না।

তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ এই চিন্তা কর, ক্রমে বুঝিবে সকলই মায়া, পরে ভগবানকে পাইবে, ঐহিক ও পারলৌকিক অমরতা লাভ করিবে। আমার সহিত এখন আমার আশ্রমে চল। গণেশ উঠিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য নাই, সন্ন্যাসী তাঁহার কমণ্ডলু হইতে তাঁহার মুখে কি ঢালিয়া দিলেন, সেই অমৃত পান করিয়া তাঁহার শরীর সবল হইল। মন সতেজ হইল, বলিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর আমি তোমার শিষ্য হইব, আমার কেহ নাই, আমার বাড়ী ঘর নাই, আমি এ সংসারে মৃত। আমি তোমার কাছে থাকিয়া সেই পরম পুরুষের চিন্তা করিতে শিক্ষা করিব।" সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, এখনও হৈমবতী চৈৎমল্ল ও হিঙ্গণের চিন্তায় তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন, তুমি কি করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা শিক্ষা করিবে। গণেশ অবাক হইলেন। তিনি যে সেই মুহূর্ত্তে হৈমবতী, চৈৎমল্ল, ও হিঙ্গনের চিন্তা করিতেছিলেন তাহা সন্ন্যাসী বুঝিলেন কি করিয়া, সন্ন্যাসী কি অন্তর্য্যামী? সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, আমি অন্তর্য্যামী নই, আমি তোমাকে চিনি, আমি ফকীর-সন্ন্যাসী, ভারতের সর্ব্বত্র আমি যাই, আমি ভাটুরিয়ার রাজা গণেশ চন্দ্র সিংহকে চিনি। যদি তুমি দেশে ফিরিয়া যাইতে চাও, আবার স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারী হইতে চাও চল তোমাকে কুলপী লইয়া যাই, কোন নৌকায় তুলিয়া দিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা করিতে পার স্ত্রী পুত্রের মুখ আর দেখিবে না তা হইলে, আমার সঙ্গে চল। ঘোর গহনে আমার কুটীর আছে, সেখানে আমার আরও শিষ্য আছে তুমিও শিষ্য হইবে। আমি আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেছি, কিন্তু এখনও

তাঁহার অন্ত পাইলাম না, যতদিন না পাইব ততদিন চিন্তাই করিব। দেখ আমার এ দেহের ক্ষয় নাই, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিলাম এখনও তাহাই আছি।

গণেশ আশ্চর্য্য হইলেন, ভাবিলেন এ কোন কপট সন্ন্যাসী, কালভৈরব, তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া মহাশক্তির নিকট বলি প্রদান করিবেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কে জানে মনুষ্যের হৃদয় কি পদার্থে গঠিত!। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যিনি মৃত্যুকে অনন্ত আরামের শান্তি নিকেতন মনে করিয়াছিলেন, মৃত্যু হয় নাই বলিয়া বিধাতাকে কত ডাকিতেছিলেন, তিনি আবার বলিদানের কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই প্রকৃতস্থ হইয়া বলিলেন, চলুন কোথায় যাইতে হইবে।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঘোর গহনে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘোর বনে একটী ভগ্ন দুর্গে সত্যসত্যই মহাশক্তির মন্দির, সেই মহাশক্তির মন্দিরে দেবীর সম্মুখে গণেশ দীক্ষিত হইলেন। তিনিও সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার মত আরও অনেক সন্ন্যাসী দেখিলেন, যখন দীক্ষিত হইলেন তখন বুঝিলেন ইঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, ইঁহারা কোনও গূঢ় কারণে সন্ন্যাসীর ভাণ করিয়া এই ঘোর কাননে অবস্থিতি করিতেছেন।

—:০:—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:০:•—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোস্মি তথাকরোমি॥

সন্ন্যাসী সেই পুরাণ ইষ্টকালয়ে হৈমবতীর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। হৈমবতীর স্বামী জীবিত আছেন মনে করিয়া তাঁহার স্বামীর বিস্তর অনুসন্ধান করাইলেন। সন্ন্যাসী নদী তীর-বর্ত্তী গ্রাম সকলে বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে যখন হতাশ হইলেন, হৈমবতী কাঁদিয়া বড় ব্যস্ত হইলেন। এদিকে সংবাদ পাইলেন বঙ্গেশ্বর চৈৎমল্ল ও হিজলকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, গণেশের জমিদারী আর একজনের হইয়াছে, এই সকল শোকে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, সন্ন্যাসী যথার্থ সাধুপ্রকৃতি, কিন্তু হৈমবতীর জন্য তাঁহাকে সংসারীর ন্যায় চিন্তাশীল হইতে হইল। তিনি হৈমবতীর হাত দেখিয়া জানিতে পারিয়াছেন গণেশ এখনও জীবিত, হৈমবতী এক সময় রাজরাজেশ্বরী হইবেন। তাঁহার কথায় হৈমবতী এখনও জীবিত রহিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, কই গণেশ ত আসিলেন না। হৈমবতী ক্রমশই ক্লিষ্ট হইতে লাগি-লেন। সন্ন্যাসী বুঝিলেন তাঁহার গণনা ভুল, সন্ন্যাস আশ্রম, জপ তপে তাঁহার অভক্তি জন্মিতে লাগিল। যে জগতে হৈমবতীর ন্যায় সতীসাধ্বীর এই ভীষণ মৃত্যু যন্ত্রণা, সে জগতে আবার পাপ পুণ্যের বিচার কি?

সন্ন্যাসী প্রাণপণে হৈমবতীর সেবাশুশ্রূষা করেন, হৈমবতী তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। হৈমবতী একদিন বলিলেন, পিতা আমার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে, মৃত্যু-কালে স্বামী ও সন্তান দর্শন আমার অদৃষ্টে নাই, আমি কি পাপ করিয়াছি যে আমার অদৃষ্টে বিধাতা এত দুঃখ লিখিয়াছেন।

হৈমবতীর কথায় সন্ন্যাসীর বুকে শেল বিঁধিল, তিনি যথার্থই হৈমবতীর পিতা, এপর্য্যন্ত পরিচয় দেন নাই, হৈমবতী যখন বালিকা তিনি সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া আসিয়া সাগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি গুরুর নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন, যদি তাঁহার শিক্ষা মিথ্যা হয় ত জানিবেন, যে জপতপ সবই মিথ্যা। তিনিই এই আশ্রমে ইহাঁকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া নিজে তপস্যার জন্য ঘোর বনে চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে আসিয়া ইহাঁর আশ্রমস্থিত ইহাঁর শিষ্যদিগকে লইয়া যান। গুরুদেবের প্রতি ইহাঁর এত ভক্তি যে তাঁহার কোন কার্য্যের প্রতি ইহাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। এইরূপে কত শত শিষ্য লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গুরুদেব যখনই আইসেন তিনি একা ছাড়া তাঁহার সহিত আর কেহ আইসে না।

আজ গুরুদেবের উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ হইল। তিনি যে বিদ্যা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন তাহা ত সমস্ত মিথ্যা। তাঁহার কথামত কত লোককে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। সে সকল লোক লইয়াই বা গুরুদেব কি করিয়াছেন? বিসূচিকা হইতে যে সমস্ত রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, গুরুদেবের প্ররোচনায় তাহাদিগকে অসময় উপকার করিয়াছেন বলিয়া ভুলাইয়া সংসার

ত্যাগে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করাইয়া কোথায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এত শিষ্য লইয়া তিনি কি করিয়াছেন? তবে কি গুরুদেব শক্তি উপ-সক? কোন কাপালিক ভৈরব? তিনি কি এত লোক মহাশক্তির স্থানে বলি দিয়াছেন? এ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তবে ত তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?

আজ হৈমবতীর পীড়া এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে জীবন সংশয়, হৈমবতী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন পিতঃ আমার সময় হই-য়াছে আমি চলিলাম। মৃত্যু সময় একবার চৈৎমল্ল ও হিজনকে দেখিতে, পাইলাম না। মনে আমার ক্ষোভ রহিল। আমার স্বামী নাই থাকিলে নিশ্চয়ই এতদিন আমাকে তিনি লইয়া যাইতেন। হৈমবতী রোগের যন্ত্রণায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি যেন দেখিতে পাইলেন চৈৎমল যবনের বেশে তাঁহাকে ছুঁইতে আসিতেছেন, তিনি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী একমনে গুরুদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন মুদ্রিত, ভয়, পাছে নয়ন মেলিলে দেখিতে পান হৈমবতী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। হৈমবতীকে তিনি আপন প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিয়াছেন। সেই হৈমবতী তাঁহার সাম্‌নে চলিয়া যায়। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও আজ গৃহী। তিনি এইরূপ কত চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কে তাঁহার স্কন্ধে হাত দিল। ত্রস্ত হইয়া নয়ন মেলিয়া দেখি-লেন গুরুদেব, চৈৎমল্ল, হিজন ও বিনয় তাঁহার সম্মুখে। তিনি প্রথমে মনে করিলেন তাঁহার ভ্রম মাত্র, পরে চক্ষু ভাল করিয়া মুছিয়া দেখিলেন যথার্থই গুরুদেব, সেই শ্বেত কেশ শ্বেত

বেশ ও প্রশান্ত শ্বেত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি যে ক্ষণ কালের জন্যও সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহাতে আপনাআপনি কুণ্ঠিত হইলেন।

গুরুদেব বলিলেন "বৎস আমাকে সন্দেহ করিওনা, আমি কাপালিক বা ভৈরব নহি আমি নরবলি দিই না। তুমি যত শিষ্য আমাকে দিয়াছ সকলই জীবিত তোমার প্রত্যয়ের জন্য তোমাকে দেখাইব। তোমার মত আমার অনেক প্রধান শিষ্য আছে, প্রত্যেকেই শিষ্য সংগ্রহে তৎপর। আমরা আর কিছু কাল না আসিলে হৈমবতীর মৃত্যু হইত আমি জানিতে পারিয়া চৈৎমল্ল ও হিরনকে লইয়া আসিয়াছি। ইহাঁদিগকে আনিবার জন্য আমি পাণ্ডুয়ায় গিয়াছিলাম এই জন্য এতদিন আসিতে পারি নাই।

এই গুরুদেবই ফকীর বেশে রিজিয়াকে হৈমবতীর পীড়ার বিষয় সংবাদ দিয়াছিলেন। এবং বিনয়ও চৈৎমল্লকে পাইয়াও হিরনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল বলিয়া এতদিন আসিতে পারেন নাই।

সন্ন্যাসী গুরুদেবের কথায় অবাক্ হইলেন, গুরুদেব আপনি অন্তর্য্যামী আপনি সকলই জানিয়াছেন। আমার এপাপ মতি কেন হইল, অথবা মায়ার মোহে আবদ্ধ হইলে লোকে বিবেক শূন্য হয় আমার হৈমবতীর মায়ায় তাহাই হইয়াছে।

গুরুদেব আপনার কমণ্ডলুস্থিত পানীয়, হৈমবতীকে খাওয়াইলেন হৈমবতীর তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইল। চৈৎমল্ল ও হিরনকে দেখিয়া তাঁহার শরীরে যেন দ্বিগুণ বল হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন ও গুরুদেবকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

তাঁহকে কোথায় দেখিয়াছেন বোধ হইল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

চৈৎমল্ল হিঙ্গন বিনয় ও হৈমবতী চারি জনেই অনেকক্ষণ কাঁদিলেন কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। হৈমবতীর হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মনে মনে ভাবিলেন আমিই এই যন্ত্রণার মূল। স্বামী ত সাগরে যাইতে সম্মত ছিলেন না। আমিই তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলাম। রাজ্য ধন সবই গিয়াছে, স্বামীও স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আমি অভাগিনী যন্ত্রণা ভোগের জন্য রহিয়াছি।

তাঁহার কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন মা তুমি রাজলক্ষী, তোমার কোনও দোষ নাই, তুমি যাহা করিয়াছ তাহা ঈশ্বরের কায, ঈশ্বর তোমায় মতি দিয়াছিলেন। তুমিই বঙ্গ স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছ। তুমি যাহা করিয়াছিলে তাহা না করিলে সুলতান গিয়াসউদ্দীন এখন ও বঙ্গ সিংহাসনে আরূঢ় থাকিতেন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা সহজ হইত না।

মা, তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই। তিনিই হিন্দুর ভরসা, আমরা তাঁহাকে লইয়া বঙ্গের সিংহাসনে বসাইব। যত দিন বঙ্গ স্বাধীন না হইবে তত দিন তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহী হইতে পারিবেন না। তিনি আপাততঃ মহাশক্তির মন্দিরে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, এখন তিনি সন্ন্যাসী আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে তুমি ও চৈৎমল্ল জীবিত কিন্তু তোমরা তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে শ্রাদ্ধাদি করিয়াছ। সেই জন্য তিনি এক্ষণে সংসারে বিরক্ত এখন এ বেশে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন

না। আমার কথা শুন, যাহাতে তোমার ভাল হয় তাহাই করিব।

এই বলিয়া গুরুদেব তাঁহাদের সকলকে লইয়া সেই ভগ্ন দুর্গে আসিলেন। চৈৎমল ও বিনয় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

হিঙ্গন ও হৈমবতী সেই দুর্গের এক কক্ষে রহিলেন।

—:০:—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—::*::—

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরম্।

আজ মহাপূজা। খুব ধুম পড়িয়াছে। গুরুদেব সেই রাজ রাজেশ্বরী মহাশক্তির মন্দিরে ধ্যানে নিমগ্ন। মহাশক্তি সিংহারূঢ়া, দেবীর মূর্ত্তি বহু মূল্য হীরা মণিমুক্তায় ভূষিত, দেখিলে যথার্থই রাজ রাজেশ্বরী বলিয়া বোধ হয়। সন্ন্যাসী এত অর্থ কোথায় পাইলেন ?, ঈশ্বর জানেন। সে সময়ে হিন্দুর ধর্ম্মে এত আস্থা ছিল যে সামান্য কৃষক হইতে প্রাসাদবাসী রাজা পর্য্যন্ত সকলই সন্ন্যাসীর পূজা করিতেন বিশেষতঃ গুরুদেব হাত গুণিতে পারিতেন তিনি কখনও সন্ন্যাসী বেশে হিন্দুর নিকট কখনও ফকীর বেশে মুসলমানের নিকট উপস্থিত হইতেন হিন্দু ও মুসলমান হইতে সংগৃহীত অর্থে দেবীকে সাজাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। প্রথমে গণেশ,দেবীকে প্রণাম করিতে আসিলেন। তাঁহার বোধ হইল

দেবী পাষাণী নহেন, তিনি প্রণাম করিলে যেন দেবী তাঁহাকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, দেবী যেন যথার্থ জীবন্ত সিংহের উপর আরূঢ়া, সিংহ ঘাড় ফুলাইয়া তাঁহার দিকে কটমট নেত্রে তাকাইল আর দেবী সেই মুহূর্ত্তে একটী শাণিত বর্শা তাহাব চক্ষের উপর ধরিলেন, একি ভ্রম, গণেশ বিস্ময়ে ও ভয়ে পুলকিত হইলেন দৈববাণী হইল " হৈমবতী তোমাকে ত্যাগ করিয়া যান নাই। তোমাকে যখন ফেলিয়া দেয় তোমাকে ধরিতে যাইয়া বাঁশের আঘাতে অচৈতন্য হইয়া নদীর গর্ভে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছেন, তিনি জীবিত, তুমি তাঁহাকে গ্রহণকর তিনিই বঙ্গের রাজলক্ষ্মী গুরুদেবের আদেশমত কার্য্য কর বঙ্গেশ্বর হইবে, আফগানের রাজত্ব কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি হিন্দুর উপর প্রসন্ন।" তাঁহার মনে হইল যেন বহুদিনের অশ্রুত ও সেই বহুদিন শ্রুত মধুর স্বর, একি ? দেবী হৈমবতীর মুখে এই সব কথা বলাইতেছেন ? গণেশ চারিদিকে চাহিলেন দেখিলেন গুরুদেব ও সিংহারূঢ়া পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি ভিন্ন সে দেবমন্দিরে আর কিছুই নাই গুরুদেব স্থির, নিশ্চল যেন তাঁহার চক্ষের পলক নাই। আবার দৈববাণী ! গণেশ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিলেন " গুরুদেবের কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি পাঁচশত বৎসর আমার তপস্যা করিতেছেন, আমি তাঁহার সাধনায় প্রীত হইয়া হিন্দুর হইয়া আফগানের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি যত দিন যুদ্ধ শেষ না হইবে তত দিন এই সিংহারূঢ়া হইয়া তোমাদের সহিত থাকিব, কৈলাসে যাইব না।"

গণেশ শুনিলেন ও চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু গুরুদেব ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

গুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন, মহাশক্তি আজ স্বয়ং অবতীর্ণা তিনি আমাদিগকে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন। আমরা দৈববলে, বলীয়ান্ আমাদের সহিত আফগানেরা যুদ্ধ করিতে পারিবে না। সত্য আমি স্বীকার করি, একজন আফগান, দশ জন হিন্দুর বল ধরে। কিন্তু যে মহাশক্তির নিকট বনের সিংহ পরাজিত, তিনি যাহাদের অগ্রণী তাহাদের আর ভয় কি?

এই বলিয়া গুরুদেব সেই মূর্ত্তিমতি মহাশক্তির সম্মুখে গণেশকে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিলেন, সব সন্ন্যাসীদিগকে ডাকিয়া সকলের বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া যোদ্ধৃবেশে সাজাইলেন। গণেশ সেইস্থানে চৈৎমল্ল ও বিনয়কে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেলে পর দেবী বলিলেন, গুরুদেব, এ ছলনা কি ভাল হইল? আপনার কথায় স্বামীকে ছলনা করিলাম। গুরুদেব বলিলেন, মা আমি ত কিছুই ছলনা করি নাই, তুমি ত যথার্থই হৈমবতী! তুমি ত যথার্থই মহাশক্তি নতুবা তোমার পায়ের তলায় বনের সিংহ কি গুণে বশীভূত? কোন্ মানবী বনের সিংহকে এরূপে বশ করিতে পারে? হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন সে ত আপনার প্রদত্ত বিদ্যা। পরে সেই দুর্দ্দান্ত সিংহকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া দেবী যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

——:০:——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

যতো ধর্ম্মো ততো জয়ঃ।

পরদিন প্রাতে গণেশকে লইয়া গুরুদেব সেই দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে গেলেন। সেখানে একটী ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া নিম্নস্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে যুদ্ধের উপযুক্ত কত বন্দুক, কামান, তরবারি, বর্শা, তীর ধনু ও বারুদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা দেখাইলেন। গণেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন গুরুদেব আপনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন, সন্ন্যাসী হইলে আপনি এ সকল কোথায় পাইলেন? গুরুদেব বলিলেন বৎস আমি সন্ন্যাসী বই কিছুই নই। তাহা না হইলে তোমাকে খুঁজিব কেন, তোমাকে পাইনাই বলিয়া আজ দুইশত বৎসর মুসলমান রাজত্ব করিতেছে কিছুই করিতে পারি নাই। গণেশের একবার ইচ্ছা হইলে জিজ্ঞাসা করেন, যে এতদিন কি করিয়া বাঁচিয়া আছেন, আবার দেবীর দৈববাণী মনে হইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। মনে মনে স্থির করিলেন গুরুদেব যথার্থই কোন মহাপুরুষ। দুইশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের উদ্ধার কল্পনায়, যত্ন করিতেছেন। ভাবিলেন ইঁহার মত মহাপুরুষ থাকিতে ভারত পরাধীন হইল কেন? গুরুদেব যুদ্ধের উপকরণ সমস্ত দেখাইয়া তাঁহাকে দুর্গের আর এক প্রান্তে লইয়া গেলেন সেখানে দেখিলেন অন্যূন বিশ সহস্র সসজ্জ যোদ্ধা যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত গুরুদেব এত লোক কোথায় পাইলেন? ইহার

জন্যই কি প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলায় যান? ধন্য গুরুদেব,তুমি যথার্থই দেবীর অনুগৃহীত। গণেশ এই ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দেখিলেন তাঁহার যে সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতি ছিল তাঁহারা সমস্তই এখানে, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইল।

একজন সেনাপতিকে দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া গণেশ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পাণ্ডুয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুরুদেব সঙ্গে চলিলেন। পাঁচ হাজার সৈন্য ও বিস্তর অর্থ দুর্গে রহিল। অবশিষ্ট পনর হাজার সৈন্য ও বিস্তর অর্থ লইয়া গণেশ বঙ্গেশ্বর সমসুদ্দীনের লক্ষাধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। পথে দুই তিনটী সামান্য সামান্য যুদ্ধ হইল। গণেশ জয়ী হইলেন। চারিদিকে প্রচার হইল যে অসুরনাশিনী দুর্গা সত্য সত্যই সিংহে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের সময় গণেশের সহায় হন। এই জন্য কোন হিন্দু জায়গীরদারের সৈন্য ভয়ে গণেশের সৈন্যের সম্মুখীন হয় না। তিনি যেপথে যাইতে লাগিলেন জায়গীরদারগণ বিনা ওজরে তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। যিনি যুদ্ধ করিলেন তিনিই হারিতে লাগিলেন, আর সত্য সত্যই দেবীমূর্ত্তি যুদ্ধের সময় দেখা যাইত। গণেশ "হর হর ভবানী" বলিয়া ডাকিলেই যুদ্ধের সময় সাক্ষাৎ ভবানী দেখিতে পাইতেন। তাঁহার সাহস দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। যখন গৌড় হইতে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমসুদ্দীনের চৈতন্য হইল।

গণেশ বলিয়া পাঠাইলেন, যে তাঁহার জমিদারী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলে, ওরিজিয়া ও বেগম্ সাহেবাকে কারামুক্ত করিলে

তিনি সৈন্য লইয়া ভাটুরিয়ায় চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সমসুদ্দীন উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, বেগম সাহেবা ও রিজিয়াকে তিনি কাটিয়া ফেলিবেন আর শীঘ্র যুদ্ধে যাইয়া কাফেরদিগকে কুকুর-দিয়া খাওয়াইবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রিজিয়ার পত্র।

প্রিয়তম,

আজ আমার শেষ দিন। তাই আর কিছু গোপন করিবার আবশ্যক নাই। যে দিন তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম! সেই দিন হইতে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তোমার মহান্ হৃদয়ে মিসিয়া গিয়াছে। আমার হৃদয় চৈৎমল্লময়, চৈৎমল্ল আমারই, দূরে ও নিকটে তুমি যেথানেই থাক তুমি আমারই, আমি আফগান কন্যা, তোমাতে আমাতে এজগতে বিবাহ হইবে না তাহা জানি, তথাপি তুমিই আমার স্বামী, তুমি পুরুষ তোমার অনেক স্ত্রী হইতে পারে, তুমি হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করিও, আর যখন সুখী হইবে তখন এই মৃত স্ত্রী রিজিয়ার কথা স্মরণ করিও। তুমি আমাকে ভাল বাসিয়াছ, তাহা তুমি না বলিলেও আমি জানিয়াছি। আমি এতকাল যে দেবমূর্ত্তি পূজা করিয়াছি সেই দেবতাকে যে আজ আমি স্বামী বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি!

ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আজ তোমাকে সম্মুখে পাইলে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না। তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মরিতাম। আজ আমার মনে হইতেছে তুমি জন্ম জন্মে আমার স্বামী।

তোমাকে সুখী দেখিয়া যাইতে পারিলাম না এই ক্ষোভ রহিল। আজ তোমার জন্ম বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু পিতৃহন্তা, পিতামহ পিতামহী হন্তা সমসুদ্দীন আজ আর কিছুতেই ছাড়িবেনা। আজ পাপিষ্ঠ আমাদিগকে কাটিবার জন্ম নিজে তরবারি হস্তে, এই কারাগারে আসিয়াছিল। আমার সম্মুখে মায়ের অপমৃত্যু আমার অসহ্য! আমি যদি পুত্র হইতাম তাহা হইলে কি আমার মাকে আমার সম্মুখে পশুর মত কেহ বলি দিতে পারিত?

আজ অনেক কষ্টে একদিনের জন্ম সময় পাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম আল কোরাণ পড়িতে পড়িতে মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইব। কিন্তু কোন রকমেই কোরাণে মনোনিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। যতবার পড়িতে চেষ্টা করিলাম ততবারই তোমার দেবমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যেন তুমি বঙ্গেশ্বর আর আমি তোমার পার্শ্বে বঙ্গেশ্বরী। আমি কি মরিয়া হিন্দু রমণী হইয়া আসিয়া তোমার মহিষী হইব?

আমার বড় সাধ ছিল তোমাকে কোরাণ পড়িয়া শুনাইব। পিতার আদেশে একজন বিখ্যাত মৌল্‌ভীর নিকট কোরাণ শিক্ষা করিয়াছিলাম, তোমাকে যদি কোরাণ পড়িয়া শুনাইয়া তোমার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জন্ম সার্থক হইত। একথা আমি মনে স্থানদিতেও পারিনা যে মুসলমান

না হইলে স্বর্গে যাওয়া যায় না ; তবে হিন্দু ধর্ম্মাপেক্ষা যে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তাহার আর ভুল নাই। হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন কেন জানিনা। কই আমি ত কোন হিন্দুকে ঘৃণা করিতে পারিনা। প্রাণাধিক, আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। বালিকা বয়সে মৌলভীর নিকট শুনিয়াছিলাম হিন্দুরা ভূত ও সয়তানের চর, কোন মুসলমান যত হিন্দু বধ করিতে পারিবেন তিনি ততই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইবেন, আমি তাহাই শিখিয়া ছিলাম। হিন্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম। তোমাকে ও হিঙ্গনকে পাইয়া আমার সে ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। যিনি হিন্দুর স্রষ্টা তিনিই মুসলমানের স্রষ্টা, তিনি হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ জানেন না। তিনিই তোমাকে আমার জন্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমারই।

ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন তিনি আমার স্থানে যাঁহাকে পাঠাইবেন, তাঁহাকে ভাল বাসিও। তাঁহাকে রিজিয়া বলিয়া ডাকিও।

তোমারই রিজিয়া।

চৈৎমল্ল এই পত্র পাইয়া বড়ই ভাবিত ও দুঃখিত হইলেন, যে রিজিয়ার জন্ম কারাগারে থাকিয়া একদিনের জন্যও কারা যন্ত্রণাভোগ করেন নাই, যিনি মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় তাঁহার সুখের জন্ম যত্ন করিয়াছেন, সেই রিজিয়া তাঁহার জন্ম কারাগারে মরিতে যাইতেছেন এচিন্তা তাঁহার অসহ্য। যে কোন রকমে আজ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা না হইলে তিনি আর অন্ন

ধরিবেন না। নিশ্চয়ই এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই স্থির করিয়া চৈৎমল্ল পিতার নিকট বলিলেন আজই রাত্রে পাণ্ডুয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বেগম ও রিজিয়ার জীবন রক্ষা করিতে না পারিলে তিনি আর অস্ত্র ধরিবেন না একথাও বলিলেন।

গণেশ তৎক্ষণাৎ দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন।

—— o:oo:o ——

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডুয়ার যুদ্ধ।

সমসুদ্দীন প্রথমে গণেশকে একজন সামান্য হিন্দু জমীদার মনে করিয়া কোনরূপ আয়োজন করেন নাই। পরে যখন দুই এক যুদ্ধে তাঁহার সৈন্য পরাজিত ও বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং লোকে বলিতে লাগিল যে গণেশ দৈববলে বলীয়ান, স্বয়ং সিংহবাহিনী দুর্গা তাঁহার বিপদের সময় যুদ্ধে আসিয়া আফগান সৈন্যদিগকে বিনাশ করেন তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি তাঁহার পিতামহের মত নির্ভীক ও প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন। দুর্গা স্বয়ং জীবন্ত সিংহারূঢ়া হইয়া যে যুদ্ধে আসেন ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না গণেশ তাঁহার সৈন্যকে ভয় দেখাইবার জন্য ইহা প্রচার করিয়াছেন স্থির করিয়া তিনি সেনাগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য মৌল্‌ভী ডাকাইয়া কোরাণ হইতে কবচ লিখিয়া

লইলেন। এবং আপনি যুদ্ধে যাইবেন স্থির করিলেন। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে তিনি বৃদ্ধা পিতামহী ও পিতৃস্বসা রিজিয়াকে হত্যা করিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে রিজিয়া চৈৎমল্লকে ছাড়িয়া দিয়াই এই গোলযোগ বাধাইয়াছেন। চৈৎমল্ল এত অর্থ কোথায় পাইলেন নিশ্চয়ই রিজিয়া তাঁহার পিতার ধনগার হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া তাঁহাকে দিয়াছেন। তাঁহার আরও সন্দেহ হইয়াছিল যে রিজিয়ার চরিত্র ভাল নয়। তিনি ঘোর নারকী রিজিয়ার দেব চরিত্রেও যে তাঁহার সন্দেহ হইবে ইহাতে বিচিত্র কি।

ঘোর আঁধার রাত্রি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যেন প্রলয় কাল উপস্থিত। মহা কড় কড় শব্দে যেন পৃথিবী একএকবার কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে।

এই সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া, গণেশ তাঁহার সৈন্য লইয়া পাণ্ডুয়ার দুর্গ আক্রমণে যাই-তেছেন। সম্মুখে প্রবল গঙ্গা, পার হইয়া যাইতে হইবে। পার হইবার সময় কোনরূপে সুলতান জানিতে পারিলে একজন ও ফিরিবে না। যুদ্ধে হারিলেও পুনরায় নদী পার হইয়া অর্দ্ধেক সৈন্য ফিরিতে পারিবে কি না সন্দেহ, গণেশ এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত বেগে গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটীয়াছেন। মুষল ধারায় তাঁহার ও অশ্বের শরীর প্লাবিত। কিছুই দেখাযায় না। মধ্যে মধ্যে এক একবার বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে পাইলেন অদূরে এক এক কুটীরে প্রহরীগণ আগুণ জ্বালিয়া পাহারা দিতেছে। গণেশ স্থির করিলেন এ আঁধার রাত্রে এই ঝড় বৃষ্টিতে নদী পার হইবার চেষ্টা করা বৃথা, অনেক

সৈন্য ও অশ্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বিশেষতঃ চারিদিকে এত প্রহরী একজন যদি পলাইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে অতি অল্প কাল মধ্যেই সুলতান সংবাদ পাইবেন। এই স্থির করিয়া গণেশ যেমন অশ্বের মুখ ফিরাইবেন অমনি দেখিতে পাইলেন সিংহবাহিনী দুর্গা তাঁহার সম্মুখে। বিদ্যুতের আলোকে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুখের শোভা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এ কি সত্য? না তাঁহার ভ্রম? আবার ঘোর আঁধারে সব মিসাইয়া গেল। তিনি শুনিলেন যেন সেই নৈশগগণ ভেদ করিয়া স্বর্গীয় স্বরে কে বলিল, "গণেশ, নদী পার হইতে ভয় পাইও না। ঘোর আঁধার রাত্রিতে পার না হইলে আর কাল পার হইতে পারিবে না। এই বিশাল নদীতে বর্ষার স্রোতে তোমার সৈন্য কিছুতেই বিপক্ষের কামানের মুখে পার হইতে পারিবে না। তাই আজ আমার আদেশে ঘোর আঁধারে পৃথিবী আবরিত। আর মহা প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টিতে পৃথিবী কম্পিত ও প্লাবিত এই কয়জন প্রহরীকে বন্দী করিতে পারিলেই নির্ব্বিঘ্নে সৈন্য পার করিতে পারিবে।"

গণেশ বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাইলেন সকলই নিস্তব্ধ তাঁহার মনে হইলে যেন হৈমবতীর সেই বহুদিন অশ্রুত স্বর তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে। হৈমবতী কি স্বর্গে যাইয়াও তাঁহার কথা ভাবেন? হৈমবতীই কি তাঁহাকে স্বর্গ হইতে এই কথা বলিয়া দিতেছেন?

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় কে তাঁহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া অশ্বের গতি রোধ করিল, তিনি কটীতট হইতে তরবারি নিষ্কোষিত করিতে যাইয়া দেখিলেন সম্মুখে

আর কেহই নহেন তাঁহারই গুরুদেব। তিনি লজ্জিত হইয়া তরবারী রাখিয়া বলিলেন গুরুদেব, আপনি এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে এখানে কেন?

গুরুদেব বলিলেন বৎস আমি গঙ্গাস্নানে আসিয়াছি। আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর গঙ্গাস্নানে সময় অসময় কি? স্নান করিতে যাইতেছি এমন সময় যেন দেখিতে পাইলাম ভগবতী মহাদেবী মহাসিংহারূঢ়া হইয়া তোমাকে সসৈন্য আজই রাত্রে গঙ্গা পার হইতে বলিতেছেন। আমি বৃদ্ধ আমার ভ্রম হইতে পারে হয়ত বা বায়ুর স্বন্‌স্বনানি শুনিয়া আমার ভ্রম হইয়াছে। তুমি কি কিছু দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ?

গুরুদেব, এ ভ্রম নহে সত্য সত্যই মহাশক্তি আজ হিন্দুর পুনরুদ্ধারের জন্য আমার সহায় হইয়াছেন, আমি এই মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি ও তাঁহার কথা শুনিয়াছি। আজই আমি ও চৈৎমল্ল গঙ্গা পার হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিব। গঙ্গার ধারে ও দুর্গের পথে যে সকল প্রহরী আছে তাহাদিগকে বন্দী বা বিনষ্ট করিবার জন্য চৈৎমল্ল ও বিনয়কে অল্প সৈন্য লইয়া পাঠাইয়া আমি সমগ্র সৈন্য লইয়া অদ্যই রাত্রে পার হইয়া যাইব।

তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ শিবির হইতে বিনয় ও চৈৎমল্ল পঞ্চাশ জন যোদ্ধা লইয়া গঙ্গা পার হইয়া গেলেন। ঘাটিতে ঘাটিতে নিঃশব্দে প্রহরীদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহারা দুর্গের বাহির পরিখার সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! দুর্গবাসী জাগরিত, তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য

অগ্রসর হইতেছে। শেষ ঘাটী হইতে বোধ হয় একজন প্রহরী পলাইয়া যাইয়া সংবাদ দিয়াছিল। এই সেতু রক্ষা করিতে না পারিলে পিতা যে সৈন্য লইয়া পার হইতে পারিবেন না তাহা চৈৎমল্ল বেশ বুঝিলেন। পঞ্চাশ জন সৈন্য লইয়া তিনি অন্ততঃ এক ঘণ্টা অনায়াসে এই সেতুর পরপারে সুলতানের সৈন্য আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন তাহাও তাঁহার বোধ হইল তিনি বিনয়কে আদেশ দিলেন শীঘ্র যাও, পিতাকে সংবাদ দেও। তুমি না আসা পর্য্যন্ত আমি সেতু রক্ষা করিব।

বিনয় নক্ষত্র বেগে অশ্ব ছুটাইয়া উড়িয়া গেলেন।

সুলতান এত নিকটে কাফেরকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, চৈৎমল্লকে জীবন্ত ধরিবার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সেতুর নিকট আসিয়া চৈৎমল্লকে আক্রমণ করিল। চৈৎমল্ল স্থিরভাবে সেতু রক্ষা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীগণ একটী একটী করিয়া মরিতে লাগিল, ক্রমে মুসলমান সৈন্যগণ এত নিকট আসিল যে তাহারা পরমুহূর্ত্তে চৈৎমল্ল ও তাঁহার অবশিষ্ট সঙ্গীগণকে সেতু সহিত তাহাদের পারে টানিয়া লইয়া যাইবে এমন সময় বিনয় প্রায় দুই সহস্র সৈন্য লইয়া সেতুর অপরপারে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের "হর হর ভবানী" রবে নৈশগগন কাঁপিয়া উঠিল।

চৈৎমল্ল বিনয়কে দেখিয়া নাচিয়া উঠিলেন, বিনয় বলিলেন পিতা বলিয়াছেন আর এক ঘণ্টাকাল সেতু রাখিতে পারিলে তিনি পার হইয়া আসিবেন। চৈৎমল্ল বলিলেন একঘণ্টা, দুইঘণ্টা যত ঘণ্টা আবশ্যক আমি সেতু রক্ষা করিব। এই বলিয়া তিনি একটী কামান ঘুরাইয়া সেতুর মুখে স্থাপন করিয়া

চারিদিকে মৃত্যু ছড়াইতে লাগিলেন। পাঠানেরা কিছুপূর্ব্বে যাহাদিগকে অনায়াসলভ্য শীকার মনে করিয়াছিল তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল। অনেকে গড়খাই সাঁতরাইয়া পার হইবার চেষ্টা করিল, অনেকে গুলি খাইয়া সেই গড়খাইতে চিরদিনের জন্য ডুবিল। যাহারা উঠিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে মরিল। এদিকে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইয়া আসিল, মুসলমানেরা দেখিল হিন্দু সৈন্য গঙ্গাপার হইয়া দুর্গ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, চারিদিকে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আকাশ পরিষ্কার হইল। ঝড় ও বৃষ্টি থামিল। মেঘ গর্জ্জন থামিল। কিন্তু রক্ত স্রোত বহিল, ও কামান গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল॥

সমসুদ্দীন অনায়াসে দুর্গে প্রবেশ করিয়া দুই মাস অন্ততঃ দুর্গরক্ষা করিতে পারিতেন তিনি তাহা করিলেন না! কি কাফেরের ভয়ে তিনি ইঁদুরের মত বিবরে লুকাইবেন? তিনি দুর্গের বাহিরে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। হিন্দুর সহিত যুদ্ধে আফগানেরা চিরদিনই জয়ী হইতেন। সেই সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আফগানেরা প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে স্থানে স্থানে মৃতদেহের পাহাড় হইতে লাগিল। সুলতানের কামান শ্রেণী হিন্দু সৈন্যের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। গণেশ দেখিলেন, কামান থাকিতে আর রক্ষা নাই। হিন্দুর কামান অপেক্ষা মুসলমানের কামান চতুর্গুণ, হিন্দুর কামান ছোট। হিন্দুর কামানে মুসলমানের যে সৈন্য মরিতে লাগিল মুসলমানের কামানে তাহার চতুর্গুণ হিন্দু সৈন্য মরিতে লাগিল।

হিন্দু সৈন্য পলায়ন পর হইয়া উঠিল। গণেশ অশ্বপৃষ্ঠে একপ্রান্ত হইতে অার একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া সৈন্যদিগকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মৃত ও মৃত প্রায় সৈন্যের দেহের স্তূপ হইতে লাগিল। তিনি চৈৎমল্লকে ডাকিয়া বলিলেন, এ কেবল নরহত্যা করা হইতেছে, আর যুদ্ধ করা সম্ভবে না। চৈৎমল্ল তাঁহার কথা বুঝিলেন। কোন উত্তর না দিয়া খড়্গ ও বন্দুক হস্তে কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্ত লইয়া সুলতানের গোলান্দাজদিগকে অমানুষিক তেজে আক্রমণ করিলেন। প্রায় শতাধিক কামান অধিকার করিয়া সেই কামান ঘুরাইয়া সুলতানের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। "হর হর ভবানী" রবে নৈশগগন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মুসলমান সৈন্যগণ দেখিতে পাইল সত্য সত্যই জীবন্ত সিংহারূঢ়া অসুরনাশিনী দুর্গা হিন্দু-সৈন্যের অগ্রণী—তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইল। আবার তাহাদের কামানেই তাহাদের শত সহস্র সৈন্য মরিতে লাগিল। সুলতান কিছুতেই আর তাহাদিগকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইয়া গেল।

আফগান সৈন্য চারিদিকে পলাইতে লাগিল সত্য কিন্তু সমসুদ্দীন পলাইলেন না। যে হিন্দু তাঁহার পদে দলিত, যে তাঁহার চক্ষে কাফের, তাহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি অসিহস্তে, ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চারিদিকে গোলা গুলি পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার কিছুই হইল না। তিনি কবচ

ধারণ করিয়া অজেয় হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া ও দুর্দমনীয় তেজ দেখাইয়া কতক গুলি পলায়ন পর সৈন্য ফিরাইয়া একদল হিন্দু সৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর গণেশ "হর হর ভবানী" রবে সেই স্থানে আসিয়া যুদ্ধের গতি ফিরাইবার জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহার এক পার্শ্বে স্বয়ং অসুরনাশিনী মহাশক্তি। গণেশ শুনিলেন, যেন দৈববাণী হইল "সুলতানের শরীর কবচে রক্ষিত, মহাশক্তির শাণিত বর্শায় উহাঁর মৃত্যু, যিনি বঙ্গের সুলতান তিনি যবন হইলেও পৃথিবীতে দেবতা, মানুষে তাঁহাকে মারিতে পারে না."। এই কথাগুলি কে যেন ভীষণস্বরে উচ্চারণ করিল। সেই স্বর যুদ্ধের কোলাহল ভেদ করিয়া সুলতান ও গণেশের কানে গেল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল সেই অসুরনাশিনী মহাশক্তি স্বয়ং সুলতানকে আক্রমণ করিয়া শাণিত বর্শার আঘাতে তাঁহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন।

সুলতানকে পড়িতে দেখিয়া পলায়মান যবন সৈন্য একেবারে চতুর্দিকে ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। এইরূপে প্রায় দুই শত বৎসরের পর বঙ্গ স্বাধীন হইল।

—০:০০:০—

ষোড়ষ পরিচ্ছেদ।

———•:0:•———

তুমি মানবী নও যথার্থই দেবী!!

যুদ্ধাবসানে গণেশ রাজপুরী অধিকার করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আসীন হইলেন। গুরুদেবের আদেশে মহাসমারোহে মহাশক্তি পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আজ হৈমবতীর চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে বড়ই কাতর করিল। গুরুদেব বলিয়াছিলেন হৈমবতী জীবিত আছেন। কিন্তু যে হৈমবতী তাঁহাকে মৃত বলিয়া নদীতীরে ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই হৈমবতীর নিকট তিনি যথার্থই মৃত। এজীবনে তাঁহার সহিত আর হৈমবতীর সাক্ষাৎ অসম্ভব। আজ এই মহাশক্তি পূজার পর চৈৎমল্লকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া গণেশ সন্ন্যাসীর বেশে গঙ্গাসাগরে চলিয়া যাইবেন। গঙ্গাসাগরে হৈমবতী মৃতজ্ঞানে তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাসাগরে মরিয়া পর জীবনে আবার হৈমবতীর সহিত মিলিত হইবেন। এজীবনে তাঁহার সকলই শেষ হইয়াছে।

গুরুদেব তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন গণেশ হৈমবতী দেবী, মানবী নহেন। তিনি স্বর্গে তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমাকে ইচ্ছায় ফেলিয়া যান নাই। যে মুহূর্ত্তে নির্দ্দয় সঙ্গীগণ তোমাকে নদীতীরে ফেলিয়া দিয়াছিল সেই মুহূর্ত্তে তিনিও তোমার সহিত লাফাইয়া তীরে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া অচৈতন্য

হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে সেই নির্ম্মম রাক্ষসগণ মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দিয়া অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। হৈমবতী অমরতা লাভ করিয়াছেন। তুমি বঙ্গরাজ্য সুশাসন করিয়া সময়ে অমরতা লাভ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য পাইবে।

গণেশের চক্ষে জল আসিল, কহিলেন গুরুদেব! একথা পূর্ব্বে বলেন নাই কেন। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই: আমি সেই সতীসাধ্বীর সহিত মিলিত হইবার অনুপযুক্ত। আমি তাঁহাকে রাক্ষসীজ্ঞানে ঘৃণা করিয়াছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আদেশ করুন আমি সাগরে যাইয়া তপস্যা করিয়া জীবন অতিবাহিত করি।

গুরুদেব বলিলেন যদি আজ মহাশক্তি পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া হৈমবতীকে স্বর্গ হইতে সশরীরে আনিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করিও। যদি তাঁহাকে না পাও তাঁহার স্থানে অন্য দার পরিগ্রহ করিয়া সুখী হইও। তুমি বহুদিন এই হিন্দু মুসলমান অধিবাসিত বঙ্গশাসন করিয়া হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব সংস্থাপন কর। নতুবা চৈৎমল্ল এদেশ শাসন করিতে পারিবেনা। অচিরাৎ মুসলমানের হস্তে পুনর্ব্বার বঙ্গের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে। আমি সন্ন্যাসী হইয়া মনুষ্য হত্যা করিয়াছি সেই পাপের জন্য আমার নিজের জীবন মহাশক্তির নিকট উৎসর্গ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব স্থির করিয়াছি। তুমি না থাকিলে যৌবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইতে চৈৎমল্ল ও বিনয়কে কে রক্ষা করিবে? এই জন্য বলি তুমি স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া হিন্দু মুসলমান অপত্য নির্ব্বিশেষে শাসন কর।

গণেশ গুরুদেবের কথায় মনে ব্যথা পাইলেন। বলিলেন গুরুদেব হৈমবতীকে যেদিন বিস্মৃত হইব সেদিন আমার নরকেও স্থান হইবে না। হৈমবতী যথার্থ দেবী ছিলেন। আমি দৈববাণীতে তাঁহারই স্বর শুনিতে পাই। হা বিধাতঃ হৈমবতীকে ভুলিয়া আমি অন্য স্ত্রী লইয়া সুখে রাজ্য করিব!। গুরুদেব বলিলেন তবে তাঁহার মুখ দেখিবেনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে কেন?

গণেশ বলিলেন মানুষ আপনার দুঃখ ও যন্ত্রণা আপনি ডাকিয়া আনে। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। সেই স্বর্গারূঢ়া পবিত্রহৃদয়া সাধ্বীর প্রতি যে ক্ষণকালের জন্যও বিরক্ত হইয়া তাঁহার মূর্ত্তি ঘৃণার চক্ষে কল্পনা করিয়াছিলাম সেই পাপের জন্য আমার হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্য করিব। আমার সেই পাপ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই ত সেই সতী অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গুরুদেব বলিলেন চল আজ মহাশক্তির মন্দিরে, পূজার পর যাহা করিতে চাও করিও।

এই বলিয়া উভয়ে সেই মহাশক্তির আরাধনার্থ মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। মহাশক্তি পূজার পর অধিকাংশ দীপ নির্ব্বাপিত। স্তিমিত আলোকে গণেশ দেখিলেন যেন সেই মহামহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরী মহাশক্তি রূপিণী সিংহবাহিনী মহাদেবী মূর্ত্তিমতি তাঁহার সম্মুখে বিরাজিতা। যেন ধীরে ধীরে সিংহ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন। একি স্বপ্ন? গণেশ চারিদিকে চাহিলেন, দেখিলেন

গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই তথায় নাই। সেই শ্বেতকেশ শ্বেতবেশ সন্ন্যাসী ডাকিলেন মা হৈমবতী, তুমি যথার্থই হৈমবতী, তোমারই কৃপায় অসুর বিনাস হইয়াছে। আর কেন, যথেষ্ট কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়াছি। তুমি বঙ্গেশ্বরী হইয়া পতি পুত্র লইয়া সুখী হও।

দেবীমূর্ত্তি যথার্থই সেই জীবন্ত সিংহ হইতে অবরোহণ করিয়া গণেশের পায় পড়িলেন, গণেশ ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। একি? গুরুদেব, একি ইন্দ্রজাল! জীবন্ত সিংহ কিগুণে বশীভূত, সত্য-সত্যই কি হৈমবতীকে ফিরিয়া পাইলাম। গুরুদেব! যদি ইন্দ্রজাল হয় ত চিরকালই আমি যেন এইরূপ মোহগ্রস্ত থাকি, আমি আর সত্যের আলোকে আলোকিত হইতে চাহি না।

গুরুদেব বলিলেন বৎস ইহা ইন্দ্রজাল নহে। সত্য সত্যই তুমি হৈমবতীকে ফিরিয়া পাইলে। হৈমবতীর গুণে বনের সিংহ তাঁহার বাহন। তুমি যে যুদ্ধের সময় ও দেবমন্দিরে মহাশক্তির মূর্ত্তি দেখিয়াছিলে তাহা হৈমবতীর মূর্ত্তি যে দৈববাণী শুনিয়াছিলে, তাহা হৈমবতীরই উক্তি।

হৈমবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন স্বামীন্, প্রাণেশ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার সহিত ছলনা করিয়াছি মহাপাপ করিয়াছি। গুরুদেবের কথায় ভুলিয়াছিলাম। যে পাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্য নাই, স্বামীকে ছলনা করি-য়াছি। মানুষ মারিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছি, মানুষী হইয়া দেবী সাজিয়াছি মানুষী হইয়া মানুষের পূজা গ্রহণ করিয়াছি।

গণেশ আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন হৈমবতী তুমি মানুষী নও তুমি যথার্থই দেবী।

—:০:—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

প্রত্যাখ্যান না প্রেম?

চৈৎমল্ল যুদ্ধাবসানে কারাগারে যাইয়া বেগমের ও রিজিয়ার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের পাইলেন না। তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল তবে কি দুরাত্মা সমসুদ্দীন যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কারা রক্ষকের নিকট শুনিলেন যে বেগম ও রিজিয়া সাধারণ কারাগারে ছিলেন না, তাঁহারা কি অবস্থায় আছেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

চৈৎমল্ল ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে হইল যেন সকল পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে। যেন তাঁহার হৃদয় শূন্য। কতকাল পরে আজ বঙ্গ স্বাধীন। কতকাল পরে পিতামাতার সন্দর্শন পাইয়াছেন আজ তাঁহার কি আনন্দের দিন! কিন্তু এ সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। তাঁহার হৃদয় রিজিয়াময়। হায়, যৌবনে প্রেম এইরূপই হৃদয়কে উদ্ভ্রান্ত করে। তখন প্রেমিকের হৃদয় মন্দিরের উপাস্য দেবতা ভিন্ন এই বিশাল ধরার আর যাহা কিছু আছে তাহা বিস্মৃতির

অগাধ জলে ডুবিয়া যায়। পাঠক তুমি আজ দার্শনিক হইয়াছ আজ অনায়াসেই বুঝিতেছ যে চৈৎমল্ল কি পাগল কিন্তু তোমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বল দেখি তুমি কি কোনও দিন এইরূপ উদ্ভ্রান্ত হও নাই। যদি না হইয়া থাক তুমিই ধন্য।

চৈৎমল্ল কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলেন তাহা তাঁহার চৈতন্য নাই। এই কারাগার হইতে তাঁহার আর বাহিরে যাইবার সাধ নাই। রিজিয়ার পত্রে জানিয়াছিলেন তিনি কারাগারে। তবে কি কারারক্ষক তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন?

এই কারারক্ষক রিজিয়ার ভুবন মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সমসুদ্দীনের ভয়ে এতদিন কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। যখন সংবাদ পাইলেন যে যুদ্ধে সমসুদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে তখন তিনি রিজিয়াকে আপনার বাসনা জানাইলেন। রিজিয়া দুর্বৃত্তের চরিত্র বিশেষ রূপে জানিতেন। তিনি অনেক অনুনয় করিয়া বলিলেন "আপনি, আমার রক্ষাকর্ত্তা, আমি আপনার বন্দিনী, আপনি আমার পিতার সমতুল্য আপনি ওরূপ কথা মুখে আনিলেও আপনার পাপ হয়।

খাঁ সাহেব "তোবা তোবা" পড়িয়া বলিলেন "আজ আমি কোন কথায় ভুলিব না, আজ আর তুমি সুলতানের কেহ নও, যে তোমাকে ভয় করিব। আজ আমার কথা না শুনিলে তোমাকে আমি জোর করিয়া বিবাহ করিব। কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া কারাধ্যক্ষ রিজিয়াকে অন্য ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বেগমকে অন্য একটী ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

হায়, যাঁহাদের সুখের জন্ম লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যায় করিতে গিয়াস-উদ্দীন কুণ্ঠিত হইতেন না। যাঁহাদের সুখের জন্ম তাঁহার বঙ্গ সাম্রাজ্য অতি ক্ষুদ্র বোধ হইত সেই বেগম ও সোনার পুত্তলী রিজিয়া আজ একজন সামান্ত দুর্বৃত্ত কারাধ্যক্ষের হস্তে অপমানিত। হে জগদীশ্বর তুমিই জান, কেন মানবের অদৃষ্টে এই অবস্থা বিপর্য্যয়।

বেগম প্রথমে অনেক অনুনয় করিলেন পরে গালি দিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত কিছুতেই শুনিল না। রিজিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন আমাকে স্পর্শ করিওনা, কোথায় যাইতে হইবে বল আমি যাইতেছি, আমার নিকটে আসিওনা, যদি আইস হয় তুমি মরিবে না হয় আমি মরিব, এই দেখ এই বলিয়া রিজিয়া একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইলেন, বলিলেন যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার নিকটে আসিবে আমি এই ছুরী তোমার বুকে বসাইব পরে আপনার বুকে বসাইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

রিজিয়ার কথায় দুর্বৃত্তের ভয় হইল, হীন বল রমণীর হস্ত হইতে ছুরী অন্য সময় অনায়াসেই লইতে পারিবে মনে করিয়া এবং এখন বল প্রকাশ করিলে পাছে রিজিয়া আপন গলায় ছুরীবসাইয়া দেন এই ভয়ে আর কিছু বলিল না। বলিল আইস আমার সহিত, এই বলিয়া ভিন্ন কক্ষে তাঁহাকে লইয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল।

চৈৎমল্ল যখন আসিলেন তখন রিজিয়াকে ভিন্নস্থানে লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু রিজিয়া ও বেগম যে এই কারাগারে ছিলেন তাহা তাঁহার

সন্দেহ হইল। এক এক করিয়া সমস্ত বন্দীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা অম্লান বদনে বলিল তাহারা রিজিয়া ও বেগমের নাম ও কখনও শুনে নাই। ভয়, কিছু বলিলে কারাধ্যক্ষ পরে তাহাদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখিবে না।

চৈৎমল্ল এই কারাগারে একটী ঘরে দেখিলেন দুইটী বন্দী থাকিবার স্থান অন্য ঘর অপেক্ষা এই ঘরটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। শয্যা সামগ্রী বন্দীর শয্যার অপেক্ষা অনেক গুণে পরিষ্কৃত তিনি অন্য মনে সেই শয্যা তুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন একখানি পত্র তাঁহারই নামাঙ্কিত ও রিজিয়ার হস্ত লিখিত তিনি পত্র খানি হস্তে লইবামাত্র কারাধ্যক্ষ বুঝিতে পারিল যে এই সামান্যসূত্রে তাহার সমস্ত পাপ ধরা পড়িবে। আর উপায় নাই। জগদীশ্বর এইরূপ সামান্য সূত্র রাখিয়াই পাপীর পাপ ধরাইয়া দেন। শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে নিস্তার পায় না।

—:০:—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—::•::—

রিজিয়ার দ্বিতীয় পত্র।

কারাগারে।

তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না. তুমি আমার স্বামী কিন্তু তুমি স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলে আপনাকে অপমানিত মনে করিবে, কারণ আমি মুসলমান তুমি হিন্দু।

আমি হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে তোমাকে দেবতা বলিয়া স্থাপন করিয়াছি। সেই মন্দির হইতে সমস্ত পৃথিবী একত্র হইলেও আমার সেই দেবতা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমি জন্ম জন্মান্তরেও তোমাকে পাইব। এজন্মে তোমার সহিত আমার লৌকিক বিবাহ হয় নাই, হইতেও পারিবে না কারণ কোন মোল্লা আমার বিবাহ দিবেন না, দিলেও ধর্ম্মশাস্ত্র মতে তাহা বিবাহ গণ্য হইবে না। সেই জন্ত বলিতেছি, যিনি বিবাহ না করিয়াও ধর্ম্মের চক্ষে জন্ম জন্মান্তরের জন্ত আমার স্বামী তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি রমণী আমি জানিনা তুমি বলিয়া দিও।

আজ তুমি নসরুদ্দীনের সহিত জয়ী হইবে সন্দেহ নাই, শুনিয়াছি তোমার পিতা দৈববলে বলিয়ান্। যে পক্ষে ধর্ম্ম সে পক্ষে ঈশ্বর সহায় হন একথা অলীক নহে। তাহা না হইলে আমি মুসলমান কন্তা হইয়াও আজ হিন্দুর জয় কামনা করিতেছি কেন? যে জাতির সিংহাসন পিতৃরক্তে কলঙ্কিত যে জাতির সিংহাসন প্রজার ভক্তি ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নয় সে জাতির সিংহাসন কখনও স্থায়ী হইতে পারেনা, তাই আজ ঈশ্বর তোমাদিগকে আনিতেছেন। শুনিয়াছি তোমার পিতা বিচক্ষণ তাঁহাকে বলিও হিন্দু মুসলমান উভয় তাঁহার সন্তান, উভয়কে সমান চক্ষে দেখিতে, দেখিও তাহা হইলে মুসলমানগণ আর তাঁহাকে কাফের বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবে না।

তোমার সহিত আর দেখা হইবে না, নাই হউক, তাহাতে আর দুঃখ নাই, আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি আমি

তোমারই—যতদিন বাঁচিব তোমার ঐ দেবমূর্ত্তি ধ্যান করিব। আমার একটী প্রার্থনা আছে, এই শেষ——আমি মরিলে সমাধির সময় আসিও। আমি সংবাদ দিবার উপায় করিয়া রাখিয়া যাইব। যেখানে আমার সমাধি হইবে, সেই সমাধি ভবনে তোমার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া রাখিও। আমি সমাধিতল হইতে ঐ দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইব। তুমি আমাকে ভালবাস তাই তোমার নিকট এই আবদার। যদি বল তুমি আমাকে ভাল বাস আমি কি করিয়া জানিলাম, যদি না জানিতাম তাহা হইলে তোমাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতাম না। জন্মান্তরে তুমি আমার স্বামী ছিলে। মন জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞ। সেই জন্য জানিয়াছি। যদি মুসলমান কন্যার সমাধি ভবনে তোমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলে তোমায় কেহ নিন্দা করে সে নিন্দা গ্রাহ্য করিওনা। যিনি তোমার রাণী হইবেন তাঁহাকে এই পত্র দেখাইও। তিনি আমাকে ভগিনী জ্ঞানে আমার এই প্রার্থনায় অসম্মত হইবেন না। তোমাকে আমি তাঁহাকে দিয়া গেলাম। আমি প্রতিদানে প্রতিমূর্ত্তি আকাঙ্ক্ষিনী এই কথা তাঁহাকে বলিও।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সুখী হও। হিঙ্গনকে আমার কথা বলিও। এখনত বিনয় হিঙ্গনের বাসোপযোগী রাজ-প্রাসাদ পাইবেন। হিঙ্গন কতদিনে সেই প্রাসাদে রাজরাণী হইবে? যদি বাঁচিয়া থাকি আমি সেই সুখের দিনে অধিষ্ঠান হইব।

আর এক কথা, মৃত্যু কি? মৃত্যু কি উন্নততর জীবনের পথ নয়? আমার দিন নিকট হইয়াও আবার সরিয়া যাইতেছে।

আমি এই কারাধ্যক্ষের পাপ আকাঙ্ক্ষার দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য মৃত্যুই একমাত্র পথ স্থির করিয়াছি।

কলঙ্কিনী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ এরূপ বিপদে পড়িয়া আত্মহত্যা করিলে পাপ হয় কি? আমাদের বংশে প্রায় কেহই শান্তিতে মরিতে পায় না, সেই জন্যই বোধ হয় ঈশ্বর আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন, অন্য অবস্থায় আত্মহত্যা করিলে পাতকিনী হইতাম, আত্মহত্যা আমার অদৃষ্টের লিখন, তাই এই বিষম অবস্থায় পড়িয়াছি। আমি এ অবস্থায় মরিলে আমাকে আত্মঘাতিনী বলিয়া ঘৃণা করিওনা।

আর একটী কথা, এই কারাধ্যক্ষ নরপিশাচ। যদি কখনও তোমার ক্ষমতা হয় ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিও। এ নরপিশাচ কারাধ্যক্ষ হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহাকে তাড়াইয়া দিও। কিন্তু ইহার স্ত্রী পুত্রকে ভুলিওনা।

আজ এজন্মের মত বিদায় দেও, আবার যখন তোমাকে পাইব তখন আর বিদায় লইতে হইবেনা।"

"রিজিয়া।"

চৈৎমল্ল এই পত্র পড়িয়া সব বুঝিলেন। রাগে ও দুঃখে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রিজিয়া কোথায়?" সে নরাধম স্থির স্বরে উত্তর দিল "আমি জানি না।"

চৈৎমল্ল তাহার এই উত্তরে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহাকে ধরিয়া নিকটস্থ গবাক্ষে বাঁধিয়া তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কাটিতে গেলেন। তখন সে প্রাণ ভয়ে আকুল হইয়া

বলিল আমাকে ছাড়িয়া দিন আমি রিজিয়াকে অন্ধকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। আমি দেখাইয়া দিব।

চৈৎমল্ল তাহার বন্ধন খুলিয়া দুই জন সৈনিকের হস্তে তাহাকে দিয়া বলিলেন "চল, কোথায় সেই কারাগার, দেখাইবে চল।"

চৈৎমল্ল রিজিয়াকে ও বেগমকে কারামুক্ত করিয়া রাজ পুরীতে তাঁহাদের পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিলেন।

দুইশত বর্ষ পরে আজ বঙ্গ স্বাধীন। আজ আবার বঙ্গে বঙ্গেশ্বরের রাজ্যাভিষেক। মহাসমারোহে গণেশ স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রার সহিত তৌল হইলেন। সেই ধনরাশি সমগত হিন্দু ও মুসলমান ভিখারীগণকে বিতরণ হইল। গণেশ প্রথমে হিন্দু মতে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পরে মুসলমান সুলতানের বেশ পরিধান করিয়া কোরোণোক্ত মতে অভিষিক্ত হইলেন। হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হইল। হিন্দু বলিল, গণেশ আমাদের রাজা মুসমান বলিল গণেশ আমাদের সুলতান। গণেশ বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন বলিলেন, আমি রাজা কি সুলতান কিছুই নই। আমি প্রজা সেবক। মুসলমান ও হিন্দু উভয়ই আমার প্রজা, সুতরাং আমার সন্তান। সেই অবধি যে পর্য্যন্ত গণেশ জীবিত ছিলেন কখনও হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয় নাই। আর একবার হইয়াছিল, সে তাঁহার মৃত্যুর পর। হিন্দু তাঁহার শবদাহন করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল মুসলমান তাঁহার শব সমাধিস্থ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল। কোন্ দেশে কোন্ রাজা এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাকে বশীভূত করিতে

পারিয়াছেন? আমরা কেবল উপন্যাস লিখিতেছি না। যাঁহারা ইতিহাস পাঠকরিয়াছেন। তাঁহার এতত্ত্ব অবগত আছেন।

—•:0:•—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:0:—

ভাল বাসার পরিণাম।

রিজিয়াকে কারামুক্ত করিবার পর চৈৎমল্ল আর তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই। যতবার তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কথা বলিয়াছেন, তত বারই রিজিয়া কোন ও না কোন কারণে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে অসমর্থ বলিয়া জানাইয়াছেন। চৈৎমল্লের হৃদয় রিজিয়াময়, রিজিয়া তাহা জানেন। সেই জন্যই তিনি সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। রিজিয়া মনে করিয়াছিলেন তাঁহাকে না দেখিলে চৈৎমল্ল ক্রমে নিজের হৃদয়কে বশীভূত করিতে পারিবেন। রিজিয়া এখন পরম সুখী, তিনি হিঙ্গন ও বিনয়ের সুখে সুখী, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে যাঁহার আকাঙ্ক্ষিণী, তাঁহার সুখে সুখী। কিন্তু চৈৎমল্লের মনে সুখ ও শান্তি নাই। রিজিয়ার তুলনায় শত বঙ্গরাজ্য ও তাঁহার নিকটতুচ্ছ, তাঁহার হৃদয় রিজিয়াময়। যিনি বিপদের সময় তাঁহার একমাত্র সুহৃদ, যিনি সুলতান পুত্রী হইয়া সামান্য বন্দীর জন্য যত্নবতী যিনি রূপে ও গুণে অতুলনীয়া, তিনি আজ

উদরান্নের জন্য পর মুখাপেক্ষিণী, এ চিন্তা চৈৎমল্লের অসহ্য। কি করিলে তিনি সুখী হন; কেন তিনি তাঁহাকে ভাল বাসেন তাঁহাকে ভাল বাসিয়াই তাঁহার এই দুর্দশা এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে শেলসম বিদ্ধ করিল। এ জীবনে রিজিয়া তাঁহার হইতে পারেন না, তিনিও রিজিয়াকে পাইবেন না তাহা তিনি বুঝিয়াছেন।

হৈমবতী ও বেগম উভয়েই রিজিয়া ও চৈৎমল্লের মনের গতি বুঝিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। কি উপায়ে তাঁহাদের রক্ষা করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। স্বধর্ম্মাবলম্বী কোন যুবককে বিবাহ করিবার জন্য বেগম রিজিয়াকে অনুরোধ করিলেন হৈমবতী কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু রিজিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি হৈমবতীকে বুঝাইলেন যে মনে মনে তিনি চৈৎমল্লকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছেন তাঁহার কি আর বিবাহ হইতে পারে? এজন্মে তিনি চৈৎমল্লের মূর্ত্তি পূজা করিয়া পরজন্মে তাঁহাকেই স্বামী পাইবেন। এজন্মে তিনি ত চৈৎমল্লের আকাঙ্ক্ষিণী নহেন, এজন্মে আরম চৈৎমল্লের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি চৈৎমল্লের পক্ষে মৃত যখন সময় হইবে তিনি চলিয়া যাইবেন, স্বর্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। সেখানে ঈশ্বর হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ দেখেন না।

হৈমবতীর চক্ষে জল আসিল তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিলেন রিজিয়া তুমিই সতী, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী করুন। ভাবিলেন রিজিয়া দেবী, তিনি কখন ও যবন কন্যা নহেন।

হৈমবতীর হিন্দু ধর্ম্মে এত শ্রদ্ধাছিল যে চৈৎমল্ল ও রিজিয়া তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইলেও, তাঁহাদের বিবাহ দিতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি বঙ্গের মহারাজ্ঞী হইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু আর কখনও রিজিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য বলিতেন না। তিনি জানিতেন চৈৎমল্ল তাঁহার কি তাহার পিতার কথা ফেলিতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি বিবাহের জন্য কখনও অনুরোধ করেন নাই। আর গণেশকেও কখন অনুরোধ করিতে দেন নাই।

গণেশ যখন দেখিলেন চৈৎমল্ল বিবাহ করিলে অসুখী হইবেন তখন তাঁহার আশাছাড়িয়া দিয়া মহাসমারোহে হিঙ্গন ও বিনয়ের বিবাহ দিলেন। তাঁহার বিবাহের সময় রিজিয়া পিতৃদত্ত বহু মূল্য বসন ও ভূষণে হিঙ্গনকে সাজাইলেন, সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন আজ এই বসন ভূষণ সার্থক হইল। তোমার উজ্জ্বল আভায় স্বর্ণ ও মণিময় অলঙ্কারেরও শোভা হইয়াছে।

হিঙ্গন বলিলেন যে সুন্দর সে সকলকেই সুন্দর দেখে। তুমি আপনার রূপ বুঝি আমাতে দেখিতেছ। এই মণিময় ভূষণে তোমার ঐ শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করে দেখিবে স্বর্গ বিদ্যাধরী কি মূর্ত্তিমতী সৌদামিনী ভূতলে অবতীর্ণা তোমার ও ভ্রম হইবে। তুমি সত্য সত্যই এত সুন্দর যে আমি যদি পুরুষ হইতাম আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া বসিতাম।

রিজিয়া উত্তর দিলেন সত্য সত্যই কি তুমি এই যবন কন্যাকে বিবাহ করিতে? আমাকে কি মুসলমান বলিয়া ঘৃণা করিতে না?

ইঙ্গন বলিলেন আমি কখনও কাহাকেও ঘৃণা করিনাই। যে দিন তোমাকে ঘৃণা করিব সে দিন যেন অশনি পতনে আমার মৃত্যু হয়। ঈশ্বর কাহাকেও হিন্দু ও মুসলমান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই যখন তাঁহার নিকট হইতে আসি তখন আমরা সবই এক, শিক্ষা বিভিন্নতায় ধর্ম্মের বিভিন্নতা হয়, তাই বলিয়া পরস্পরে ঘৃণা করিব কেন. আমরা সকলেই সেই এক পিতার সন্তান—সেই পিতার ইচ্ছায় আজ আমরা একস্থানে একই উদ্দেশ্যে মিলিয়াছি। তবে আমিই বা তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব কেন আর তুমিই বা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে কেন?

রিজিয়া বলিলেন বোন, রাগ করিওনা, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলদেখি তুমি ত মুসলমানকে ঘৃণা করনা, কোনও মুসলমানকে তুমি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পার?

ইঙ্গন বলিলেন 'বিনয় আমার স্বামী, বিনয় মুসলমান হইলেও আমি তাঁহাকে সেই একই চক্ষে দেখিব। বিনয় হিন্দুর সন্তান না হইয়া যদি মুসলমান সন্তান হইতেন আমি তাঁহাকেই বিবাহ করিতাম। হিন্দু হইয়া কি মুসলমান বিবাহ করা যায় না?

রিজিয়া কোন উত্তর দিলেন না। অলঙ্কার পরাইয়া শেষ করিয়া বলিলেন, ঠিক যেন পক্ষী, দেখিও পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইয়া বিনয়কে ফাঁকি দিওনা। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে রিজিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

—০:০০:০—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন।

পিতার পরলোকান্তে চৈৎমল্ল বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি এপর্য্যন্ত দার পরিগ্রহ করেন নাই। বেগম, হৈমবতী ও হিঙ্গন কত অনুরোধ, উপরোধ করিয়াও তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

তিনি বঙ্গেশ্বর হইয়া কখনও রিজিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বাল্যকাল হইতে অভ্যাস বশতঃ তিনি পাঠানের ন্যায় বসন ভূষণে সজ্জিত থাকিতেন। বঙ্গেশ্বর হইয়াও সেইরূপ চলিতে লাগিল। মৌল্‌ভীর কাছে কোরাণ শিখিতেন, ক্রমে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। হৈমবতীর মৃত্যুর পর তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কোথা হইতে এক ফকীর আসিয়া তাঁহাকে মসজীদে লইয়া কল্‌মা পড়াইল ও তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথম জালালউদ্দীন নামে সম্বোধন করিল। চৈৎমল্ল ভাবিলেন যাহা জগদীশ্বরের ইচ্ছা তাহা তিনি কি করিয়া খণ্ডাইবেন করিয়া অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে তিনি রিজিয়ার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া ও সাক্ষাৎ না পাইয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন।

রিজিয়া!—

যেদিন প্রথমে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেদিন আমি একজন সামান্য বন্দী। তুমি দেশের সুলতানের অতি আদরের কন্যা, তুমি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইতে পার ইহা আমার ধারণা হইত না। আমার জন্য তোমার যত্ন দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। ভাবিতাম তুমি স্বর্গের দেবী, মানবী নহ। তোমাকে ভাল বাসিতাম কিন্তু অতি সংগোপনে, কেননা লোকে জানিলে আমাকে পাগল বলিত। আর তুমি? তুমিত সকলকেই ভাল বাসিতে, বিনয়, হিঙ্গন ও আর কত আমাদের মত হতভাগ্য বন্দী তোমার দয়ার ভাজন ছিল। সকলেই তোমাকে দেবী বলিয়া মনে করিত। কারাগারে তুমি আসিলে কারাগারও হাসিত। বন্দিগণের যন্ত্রণা কমিত। তুমি দিনান্তে একবার আসিতে বলিয়া ভয়ে কারাধ্যক্ষ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। আমি প্রত্যহ তোমার আশায় পথ চাহিয়া থাকিতাম, তুমি আসিলে আমার এই অন্ধকারময় জীবন আলোকিত হইত। তখন জানিতাম পিতামাতা স্বর্গে। আমাকে চিরদিনই তোমার পিতার কারাগারেই জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। যখন তোমাকে দেখিতাম তখন মনে হইত কোন স্বর্গের দেবতা মানবীরূপে আমাকে আশা দিবার জন্য আসিয়াছেন। তোমার আশায় আমি বন্দী হইতে বঙ্গেশ্বর হইয়া এখনও উর্দ্ধে চাহিয়া আছি, জানিনা আরও কতদিন থাকিব।

বঙ্গেশ্বর হইয়াও ত সুখী হইতে পারিলাম না। যখন বন্দী ছিলাম তুমি আমার জন্য ভাবিতে, প্রত্যহ দেখিতে আসিতে

বন্দী হইয়াও তাহাতে আমার যে সুখ ছিল এখন বঙ্গেশ্বর হইয়াও ত সে সুখ নাই। হে ঈশ্বর তুমি বঙ্গরাজ্য বিনিময়ে, আমাকে গিয়াসদ্দীনের সেই কারাগারে লইয়া দিনান্তে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে দেও।

লোকে বলিবে আমি তোমার জন্য মুসলমান হইয়াছি। বলুক দুঃখ নাই, তোমার জন্য আমি কি না পারি? তুমি কোরাণ পড়, এই জন্য কোরাণ পড়িতে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল সত্য, কোরাণ পড়িয়া বুঝিলাম কোরাণোক্ত ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেও আমাদের বেদোক্ত ধর্ম্মে কোন বিভিন্নতা দেখিলাম না। যদি মসজিদে গেলে দুর্দ্দান্ত পাঠানগণ আমার বশীভূত থাকে তবে মসজিদে যাইতে ত আমি কোন দোষ দেখিতে পাইনা, তাই দীক্ষিত হইয়াছি। ইহাতে বিনয় ও হিঙ্গন বড় মনে ব্যথা পাইয়াছেন। তুমি হিঙ্গনের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিও। আমি দেশের রাজা যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় আমাকে তাহাই করিতে হইবে। নিজের সুখ খুঁজিলে চলিবে কেন।

আজ সাত বৎসর তোমাকে দেখি নাই এ জন্মে আর দেখা হইবেনা। আমি বুঝিয়াছি আমার সহিত দেখা হইলে তোমার কষ্ট হয় সেই জন্য এই সাত বৎসরের মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। কিন্তু একদিনের জন্যও তুমি আমার মনোমন্দির ছাড়িয়া যাইতে পার নাই। যে মূর্ত্তি তথায় স্থাপিত করিয়াছি মন্দির না ভাঙ্গিলে আর তাহা কেহ লইতে পারিবেনা।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অন্যরূপ হইত। তাঁহার ইচ্ছা নয় এই জন্য এ জীবনে স্বামী ও স্ত্রী হইয়াও আমরা মিলিত হইতে পারিলাম না। পর জীবনে মিলিব। সে দিনের জন্য আমি

ব্যস্ত নই কারণ সেদিন আসিবেই, এজীবনে ঈশ্বরের কাজ না করিলে পর জীবনে তাঁহার কাছে সেই দিনে কি বলিয়া দাঁড়াইব ?

চৈৎমল্ল।"

রিজিয়া পত্র পড়িয়া দুঃখিত হইলেন। বুঝিলেন তিনি যে চৈৎমল্লকে ভাল বাসেন একথা তাঁহাকে জানাইয়া ভাল করেন নাই। তাহা না হইলে চৈৎমল্ল বিবাহ করিয়া সুখী হইতেন। "ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অন্যরূপ হইত।" এই কথা গুলি তাঁহার প্রাণে বাজিল। তিনি চৈৎমল্লের পত্রের উত্তরে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু যখন তাঁহার লোক পত্র লইয়া গেল তখন জেলালউদ্দীন দিল্লীর বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। দূত ফিরিয়া আসিয়া রিজিয়াকে এই কথা জানাইল।

রিজিয়া পত্রখানি আবার পড়িলেন। "আজ শত বৎসর তোমাকে দেখি নাই এজন্মে আর দেখা হইবে না।"

রিজিয়া বুঝিলেন চৈৎমল্ল কেন একথা লিখিয়াছেন। তিনি এবুঝিলেন তাঁহার জন্যই এ ভীষণ যুদ্ধ হইতে তাঁহার আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। বিনয়কে রাজ্য ভারদিয়া তিনি চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন।

আজ কত কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি কেন চৈৎমল্লের কথায় পূর্ব্বে তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই, তখন তিনি হিন্দু ছিলেন তখন তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলে ত

লোকে বলিতে পারিত না যে চৈৎমল্ল তাঁহার জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। এখন চৈৎমল্ল এই কলঙ্কের ভার মাথায় করিয়া আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন কেন, এই জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছেন রিজিয়া ভাবিলেন তিনি শতবার জীবন দিলেও কি সময় স্রোত হইতে এই সাতটী বৎসর খসিয়া পড়ে না?

তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় হিঙ্গন আসিয়া তাঁহার শরীর স্পর্শ করিলেন, তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন "কি হিঙ্গন, দিদি আসিয়াছ?

হিঙ্গন বলিলেন আমি আসিয়াছি তুমিত আর আমাকে ভাল বাসনা। যাকে ভাল বাস তাঁহাকেও চির দিনের মত বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ। তবুও ত ভাবনা যায় না।

ছি, দিদি অমন কথা বলিতে নাই। তোমার দাদা যুদ্ধ জয় করিয়া আবার শীঘ্রই আসিবেন।

হিঙ্গন বলিলেন "এজন্মে না পরজন্মে" এই বলিয়া চৈৎমল্লের একখানি লিপি তাঁহাকে দেখাইলেন।

রিজিয়া পড়িলেন।

"হিঙ্গন——

দিল্লির বাদসাহ মামুদতোগলাক আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। আমি পিতৃদত্ত রাজ্য পাইয়াছি জীবন থাকিতে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিব না। আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলাম। তিনি আমার রাজ্যে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে আক্রমণ করিব।

শুনিতে পাই তৈমুর নামক একজন তাতার দেশীয় সম্রাট বাদসাহের সহিত মিলিত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছেন। তৈমুরের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভের আশা নাই, আমি জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে যাইতেছি। আমি পরাস্ত হইলে ও তাতার সম্রাট বুঝিবেন যে তিনি আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভাল করেন নাই এ যুদ্ধে তাঁহার ও আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

আমার অনুপস্থিতি কালে বিনয় রাজ প্রতিনিধি রহিলেন। পাঠানগণ অতি দুর্দ্দান্ত, যদি আমি না ফিরিয়া আসি তোমরা কোরাণ মত দীক্ষিত হইয়া গাজিদের বশীভূত রাখিতে চেষ্টা করিও। অন্য কোন উপায়ে গাজীদের বশীভূত করিতে পারিবে না। আমি মুসলমান ধর্ম্মে ও হিন্দু ধর্ম্মে কোন বিভিন্নতা ত দেখিতে পাই না। পরিচ্ছদে ও আহারে কি ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নষ্ট হয়?

আমি মরিলে আমার জন্য কাঁদিও না। ইতি

তোমার দাদা চৈৎমল্ল।"

হিঙ্গন পত্র শুনিয়া আবার কাঁদিলেন। রিজিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া আপন মন্দিরে লইয়া গেলেন।

—::*::—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

অশনি পতন।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে তাতার দেশে তৈমুর নামে এক জন মহা পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। তিনি নানাদেশ জয় করিয়া অবশেষে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। মামুদ তোগলক তখন দিল্লির বাদশাহ, তিনি তৈমুরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং দিল্লির দ্বার খুলিয়া দিলেন।

তৈমুরের সৈন্যগণ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন পাঠান ওমরাহগণ গাজীদিগকে মাতাইয়া তুলিলেন তাহারা তৈমুরের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তৈমুর এই সুযোগই খুঁজিতে ছিলেন: তিনি আদেশ দিলেন "নগরে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক আছে সকলকেই বন্দী কর ও কাটিয়া ফেল"। এই ভীষণ আদেশ সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হইল। পাঁচ দিন ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিল।

প্রথম দিনে এক লক্ষ লোককে কাটিয়া ফেলা হইল, শত সহস্র রমণী পৈশাচিক অত্যাচারে ভগ্নহৃদয়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পিশাচ প্রকৃতি তৈমুর ইহাতে আমোদ ভিন্ন কষ্টের কোন কারণ দেখিলেন না। পাঁচ দিন অহোরাত্র এইরূপ হত্যাব্যাপার চলিল। কত পৈশাচিক অত্যাচার হইল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাদশাহ মামুদ আর সহ্য করিতে

পারিলেন না, পঞ্চম দিনে তৈমুরের নিকট যাইয়া তিনি যুক্ত-করে প্রজার প্রাণ ও মান ভিক্ষা চাহিলেন। আপনার রাজ মুকুট তৈমুরের পদ প্রান্তে রাখিলেন। তখন তৈমুর আদেশ দিলেন "আরনা"। তৎক্ষণাৎ তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য যেন কোন মন্ত্রবলে ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল। মানুষে যে মানুষের হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে পারে ইহা তাহার একটী উদাহরণ স্থল।

এই ভয়ানক পাপাচারের পর তৈমুর মসজিদে যাইয়া নমাজ করিতে বসিলেন, একমনে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে লাগি-লেন। জগদীশ্বর জানেন মানুষের মন কি পদার্থে গঠিত।

তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইল। তিনি দিল্লীর ধনগার লুঠ করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিলেন। মামুদ তাঁহাকে বলিলেন বাঙ্গালা ও বেহার লুঠ করিলে আরও অনেক অর্থ পাওয়া যাইবে। সেই প্রলোভনে তৈমুর বাদশাহের সহিত মিলিত হইয়া চৈৎমল্লের রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য যাত্রা করিলেন। চৈৎমল্ল ইহা জানিতে পারিয়া কিরূপে অগ্রেই যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বেহারের উত্তর প্রদেশে হিমাচলের পাদপ্রান্তে যেখানে উভয় সম্রাটের সৈন্য ছাউনি করিয়াছিল তাহার পাঁচ ক্রোশ দূরে চৈৎমল্ল সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিয়া রহিলেন।

——:০:——

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

সেই ধন্য নর কুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।

যখন আফগান আমিরগণ জানিতে পারিলেন যে সুলতান জালালউদ্দীন তৈমুরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন তাঁহারা বাদশাহকে পরিত্যাগ করিয়া জালালউদ্দীনের সহিত মিলিত হইলেন সহস্র সহস্র গাজী ক্রোধে ও জিগীষায় মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যাবৃদ্ধি করিল। একে গাজীগণ ভয়ানক ক্রোধপ্রবণ তাহাতে তৈমুর ও তাঁহার সৈন্যের পৈশাচিক অত্যাচারে তাহারা একেবারে মরিয়া হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে তৈমুর জালালউদ্দীনকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মামুদ তোগলক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, তিনি বলিলেন এখনও তৈমুরের সমস্ত তাতার সৈন্য আসিয়া পঁহুছায় নাই, তাঁহার নিজের সৈন্য ও সেনাপতিগণকে তিনি বিশ্বাস করেন না। কি জানি যদি বিদ্রোহী হইয়া তাহারা যুদ্ধের সময় বঙ্গের সুলতানের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। তৈমুর বাদশাহের কথায় হাসিলেন, বিপদের নামে তাঁহার তাতার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, যুদ্ধে তিনি চিরদিনই জয়ী, তিনি পরাস্ত হইতে পারেন বাদশাহ যে এই সন্দেহ করিয়াছেন ইহাতে তিনি বড়ই বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যে কালই প্রাতে

তিনি যুদ্ধ করিবেন। তৎক্ষণাৎ ছাউনি ভাঙ্গিয়া যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল।

প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল চৈৎমল্লের হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ মরিয়া হইয়া মৃত্যু আকাঙ্ক্ষায় তৈমুরের তাতার সৈন্যের সম্মুখীন হইল। বাদশাহ মামুদ তোগলক যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন কার্য্যতঃ তাহাই হইল। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই শত্রুদলে মিলিত হইল, চৈৎমল্লের সৈন্যগণ ইহাতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইল। কিন্তু তৈমুরের তাতার সৈন্যগণ ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় চারিদিকে মৃত্যু ছড়াইতে লাগিল। সে ভীষণ দৃশ্য বর্ণনাতীত। দুই প্রহর ধরিয়া যেন পিশাচে পিশাচে মহাপ্রলয় কালে পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত। রণক্ষেত্র মৃত দেহে আবরিত হইল, অশ্বারোহীর পদতলে দলিত আহত ও মৃতপ্রায় সৈন্যের আর্ত্তনাদে ও উভয় সৈন্যের বিকট কোলাহলে রণক্ষেত্র যেন পিশাচের আবাস ভূমি হইয়া উঠিল। এই তৈমুরের জয়, এই চৈৎমল্লের জয়। অবশেষে প্রায় দুই প্রহরের সময় চৈৎমল্লের তিনদল বাছা বাছা গাজি পোদ ও নমশূদ্র সৈন্য একেবারে তাতার সৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া তৈমুরের শিবির আক্রমণ করিয়া বসিল, তৈমুর স্বয়ং তরবারি ও বন্দুক হস্তে সামান্য সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তরবারির আঘাতে ও বন্দুকের গুলিতে তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহার শরীর শোণিতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল তথাপি দৃক্‌পাত নাই এদিকে চৈৎমল্লও রক্তাক্ত কলেবরে সমস্ত তাতার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় উভয়ে উভয়ের উপর পড়িলেন, চৈৎমল্ল ডাকিয়া বলিলেন আজ

তোমার ও আমার শেষদিন, উভয়ে তরবারির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, তাঁহাদের রক্ষার জন্য উভয় দলের সহস্র সহস্র যোদ্ধা সেই দিকে ঝুঁকিল। সেস্থানে হত ও আহত দেহের পাহাড় হইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে বর্শার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পড়িয়া গেলেন।

তাঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য শত শত তরবারি একেবারে উত্থিত হইল, কিন্তু ভূমে পড়িবা মাত্র দুইজন অশ্বারোহী লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া আপন আপন অশ্বে তুলিয়া কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বারোহীদ্বয় তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্রের বহুদূরে ফৌজদারের প্রাসাদে লইয়া তাঁহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন পরে আপন আপন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

যখন চৈৎমল্ল ও তৈমুরের চৈতন্য হইল তখন তাঁহারা দেখিলেন দুইটী রমণী তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত, তৈমুর তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। চৈৎমল্ল দেখিলেন রিজিয়া ও হিন্দন। তাহাদের তথায় দেখিয়া অবাক্ হইলেন। সেই দুর্দান্ত তাহার পতিকে তথায় দেখিয়া ততোধিক আশ্চর্য্য হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না!

এদিকে যখন সৈন্যগণ দেখিল তৈমুর ও চৈৎমল্ল নাই তখন উভয় দলই যুদ্ধে বিরত হইল ও আপন আপন ছাউনিতে যাইয়া প্রভুর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

উপরোক্ত ঘটনার একমাস পরে তৈমুর মহা সমারোহে রিজিয়ার সহিত চৈৎমল্লের বিবাহ দিলেন তিনি রিজিয়ার গুণে

এত মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিলেন তিনি রিজিয়ার অনুরোধে আর কখনও বৃথা নরহত্যা করেন নাই। রিজিয়া পিতৃহীনা হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তৈমুরের যত্নে ও স্নেহে তিনি পিতৃশোক ভুলিতে বাধ্য হইলেন রিজিয়ার বিবাহের দিন হিন্দুন মনের সাধে যেখানে যা সাজে তাহাই দিয়া তাঁহাকে সাজাইলেন তিনি বহুমূল্য মণিময় স্বর্ণ অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত করিয়া বলিলেন, দিদি তোমার বিবাহ কি আজ? বিবাহ একবার ছাড়া কি দুবার হয়?

ইহার কিছুকাল পরে রিজিয়ার প্রার্থনা মত মামুদ তোগলককে দিল্লীব সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৈমুর স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে আর কখনও তিনি ভারত সাম্রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। যতদিন জীবিত ছিলেন, সুলতান জালালউদ্দীনকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। বৎসরান্তে মহাসমারোহে তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার পাঠাইতেন।

জালালউদ্দীন পাণ্ডুয়া হইতে রাজধানী গৌড়ে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। সেই মহানগরীকে কত মনোহর অট্টালিকায় ও মসজিদে সাজাইলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান একই চক্ষে দেখিতেন। তিনি রিজিয়ার সহিত বহু বৎসর মহা সুখে রাজত্ব করিয়া যথাসময়ে আপন পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। তাতারসম্রাট ও তাঁহার বংশে পুরুষানুক্রমে সেইরূপ সৌহার্দ্দ চলিয়া আসিয়াছিল। বহু বৎসর পরে যখন চৈৎমল্লের পুত্র আহম্মদ সাহা বিপদে পড়িয়া তৈমুরের পুত্র সারোকের শরণাগত হইয়াছিলেন তিনি তাঁহার বিপদুদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। রিজিয়া রমণী হইয়াও গিয়াসুদ্দীনের

নষ্ট রাজ্য এইরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহারই গুণে মামুদ তোগলক্ তাঁহার সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ইহার পরও কি কেহ বলিবেন যে মুসলমান রমণীগণ পর্দ্দার ভিতর থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন সংসারের কোন উপকারে আইসেন না? চৈৎমল্ল অনেক আত্মীয় স্বজনকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনয় ও হিঙ্গনকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা গণেশের জমিদারী পাইয়া ভাটুরিয়ায় রাজা ও রাণী হইয়া রহিলেন। কত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে এখনও এই রাজবংশ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

সমাপ্ত।

—::*::—